দিশারী

কলেজ পত্রিকা
২০২০–২১

হুগলী উইমেন্স কলেজ

১, বিবেকানন্দ রোড, পিপুলপাতী, চুঁচুড়া

সরণ্যা ঘোষ, বি.এস.সি

সরণ্যা ঘোষ, বি.এস.সি

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

দিশারী

২০২০-২১

হুগলী উইমেন্স কলেজ

পিপুলপাতি, হুগলী

বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এবং ইউ.জি.সি. অনুমোদিত

Ph. No : 033-26805033 (Office)

E-mail : hooghlywomenscollege@gmail.com

Website : hooghlywomenscollege.org

দিশারী
বার্ষিক পত্রিকা ঃ ২০২০-২১

ঃ প্রকাশনা কমিটি ঃ

প্রধান পৃষ্ঠপোষক

শ্রী অসিত মজুমদার, সভাপতি
পরিচালন সমিতি, হুগলী উইমেন্স কলেজ

উপদেষ্টা

ড. সীমা ব্যানার্জী
অধ্যক্ষা, হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদিকা মণ্ডলী

শ্রেয়া বসু, সায়ন্তী দাস, সুস্মিতা দাস, ইপ্সিতা মিত্র, জুহি দত্ত, অন্তরা পাল,
রুমালী দে, অঙ্কিতা খাঁ, দিপীকা শিকদার, সহেলি রায়

সহযোগিতা

অধ্যাপিকা কবিতা দে
অধ্যাপিকা সুলেখা রায়
অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার

মুদ্রণে

সৌপর্ণ উদ্যোগে
২/৪৪এ, যতীনদাস নগর
বেলঘরিয়া, কলকাতা - ৭০০০৫৬

শ্রদ্ধার্ঘ্য

গত বছর

যাঁদের হারিয়েছি...

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B" by NAAC, Bangalore]

Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

MESSAGE

I am delighted to know that Hooghly Women's College is going to publish its Annual Magazine for the Academic Session 2020-21.

On this occasion, I convey my best wishes to the Principal, Faculty members, students, the non-teaching staff and all who are associated with the publication of the Magazine.

I wish the institution's endeavour to publish the Magazine a grand success.

PRESIDENT
GOVERNING BODY
HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE

HOOGHLY WOMEN'S COLLEGE
(Govt. Sponsored)
P.O. & Dt. Hooghly, Pin - 712103, W.B.
[Accredited "B" by NAAC, Bangalore]
Ph. : 2680-2335 (Principal)
2680-5033 (Office)

অধ্যক্ষার কলমে

আমাদের কলেজের পত্রিকা দিশারী প্রকাশ করছে মেয়েরা। যে কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই একটি বিশেষ অহংকার এই পত্রিকা। এখানে ছাত্রীরা নিজেদের চিন্তাকে প্রকাশ করতে পারে। আজ যে লেখা শুরু করেছে, আগামীতে সেই তো হয়ে উঠতে পারে আমাদের প্রতিষ্ঠানের অলংকার। হতে পারে স্বনামধন্য লেখিকা। এই অবসরে পত্রিকার সঙ্গে যুক্ত সবাইকে ধন্যবাদ জানাই।

অধ্যক্ষা
সীমা ব্যানার্জী
ড. সীমা ব্যানার্জী
হুগলী উইমেন্স কলেজ

সম্পাদকীয়

যে কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকা বস্তুতপক্ষে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সৃষ্টিশীল মনন সক্রিয় জ্ঞানচর্চার এক প্রামাণ্য দলিল। সেই অর্থে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে নিয়মিত বার্ষিক পত্রিকা প্রকাশ যেন দায়বদ্ধতার ফসল। হুগলী উইমেন্স কলেজের বার্ষিক পত্রিকা সেই পরম্পরাই সানন্দে বহন করে চলেছে।

সাহিত্য সাংস্কৃতিক অঙ্গনে প্রবেশের ছাড়পত্র মেলে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পত্রিকায় লেখা প্রকাশের মাধ্যমে। কবিতা-গল্প, প্রবন্ধ-ছবি সমস্ত কিছুই প্রকাশের মধ্য দিয়ে বার্ষিক পত্রিকা যেন উদীয়মান শিল্পী সাহিত্যিকদের আঁতুড় ঘরের রূপ লাভ করে। চিরকালীন এই প্রবাহের কোনোও সমাপ্তিরেখা নেই। হুগলী উইমেন্স কলেজের বার্ষিক পত্রিকা তাই ছাত্রীদের এবং অধ্যাপক-অধ্যাপিকা ও শিক্ষাকর্মীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানের সম্মিলিত ফসল। সাংস্কৃতিক কমিটির দায়িত্ব ছিল এই ফসল সংগ্রহ করে সময়মতো সকলের হাতে পৌঁছে দেওয়া। এই কাজে কোনো ত্রুটি থাকলে তার দায় আমাদের সুফল কিছু মিললে আনন্দের সাথে তা ভাগ করে নেওয়ার অধিকার সকলের।

দিনের পর দিন যায়, চারপাশের অনেক পরিচিত মুখ চিরতরে হারিয়ে যায়, থেকে যায় শুধু স্মৃতি। এই মহাবিদ্যালয়ে অনেক মুখ এখন শুধুই স্মৃতি। আমাদের এই পত্রিকা প্রকাশের লগ্নে এই সব স্মৃতি আমাদের বিষণ্ণ করে, তাঁদের অবদান আমরা বারে বারে স্মরণ করে থাকি।

ধন্যবাদান্তে
সম্পাদিকামণ্ডলী
শ্রেয়া বসু, সায়ন্তী দাস, সুস্মিতা দাস
ইস্পিতা মিত্র, জুহি দত্ত
অন্তরা পাল, রুমালী দে, অঙ্কিতা খাঁ
দিপীকা শিকদার, সাহলি রায়

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

২০২০ এর মার্চের পর থেকে সারা পৃথিবী কেমন যেন এলোমেলো হয়ে গেল। আমাদের সম্পর্ক পাল্টে গেল অতি দ্রুত। আমাদের সব কিছু স্থবির হয়ে গেল। আমাদের ছাত্রীরা ঠিক সময় মতো কলেজ পত্রিকাটিও প্রকাশ করতে পারলো না। তাই শেষমেশ অধ্যক্ষা মহাশয়ার পরামর্শ মতো আমাদের সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিতে হল কলেজ এবং ছাত্রীদের জন্য। পত্রিকাতে যদি কোন ভুল থেকে থাকে তার দায় আমাদের। জ্ঞানী গুণী জনেরা ক্ষমাসুন্দর সৃষ্টিতে দেখবেন।

নমস্কারান্তে

অধ্যাপিকা কবিতা দে

অধ্যাপিকা সুলেখা রায়

অধ্যাপক ড. বিশ্বজিৎ কর্মকার

সূচীপত্র

প্রবন্ধ

স্বাধীনতা তো এখনই...	রূষালী দে	১৫
ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়	সৌমী ঘোষ	১৭
সমাজের এই নীতি	সহেলী সাঁধুখা	১৮
Heal The World	Shreya Basu	১৯
Astronomy, Vedic & Ancient India	Snigdha Singh	২০
সালিহুণ্ডাম-বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমণ	ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায়	২২
রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকা'	ড. নির্মাল্য সেনশর্মা	২৪

গল্প

শিক্ষাগুরু	কমোলিকা মান্না	৩২
ভাগ্যশ্রী	দ্বীপান্বিতা নন্দী	৩৪
ভগবান বুদ্ধ	অয়ন্তিকা লাহা	৩৭

বিশেষ রচনা

ওরা অতিথি	পূজা নাথ	৩৮
একজন শিক্ষার্থীর মনে মহামারির প্রভাব	সোমশ্রী সরকার	৪০
শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ ভারতীয় সংগ্রহশালা	লাবনী মণ্ডল	৪২
অবুঝ শিশুর অবুঝ কথা	রাখী বর্মন	৪৫
কৃত্রিমতার ব্যধি	প্রিয়াঙ্কা দাস	৪৭

কবিতা

মেয়ে	ঋতিকা চক্রবর্তী	৪৯
ইচ্ছে	দেবস্মিতা স্যানাল	৫০
বাবা	লাবনী সরকার	৫১
অপেক্ষা	প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী	৫১

WHAT CAN I DO	Rampita Sarkar	৫২
Magnificent ? or, magnified cent!	Adrija Paul	৫৩
Hiraeth	Kausani Das	৫৪
আগোচর অনুরাগ	মাসুমা খাতুন	৫৫
ছন্দ	ছান্দসী প্রামানিক	৫৫
এখন বেশ সুখেই আছি	কুহেলী বর্মন	৫৬
মানুষ গড়ার খেলা	সুমিত্রা দত্ত	৫৮
তোমার দেওয়া কলম খানি	রঞ্জিতা সর্দ্দার	৫৯
আশা	প্রীতিকা চক্রবর্ত্তী	৫৯
সমাজে প্রকৃত দুর্গা	তিথি পাল	৬০
সবার সেরা ভারতবর্ষ	নাজিমা খাতুন	৬০
বিদ্যাসাগর	অপরাজিতা ব্যানার্জী	৬১
ক্ষত	মধুমিতা পাত্র	৬১
ফিরে পাওয়া	রম্পিতা সরকার	৬২
নভেল করোনা	সুপ্রীতি ঘোষ	৬৩
নারী স্বাধীনতা	শ্রেয়া ঘোষ	৬৩
অনেক দিন পর	সত্যজিৎ বিশ্বাস	৬৪

স্বাধীনতা তো এখনই ...

রুষালী দে
ইংরাজি বিভাগ, ৩য় বর্ষ

স্বাধীনতা শব্দটা নিয়ে আমি ভীষণ দোটানায় আছি, ছোটো থেকেই এটা ভেবেছি যে বড়ো হলেই স্বাধীন হবো। কিন্তু ভাবনাটা শুধু ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেছে, কারণ ছোটোবেলায় যখন স্কুলে ভর্তি হইনি, তখন ভাবতাম স্কুলে গেলে খুব মজা, কত বন্ধু ... এই সব ভেবে যখন মা এর সাথে প্রথম দিন স্কুলে গেলাম, তখনই মনটা ভীষণ ভারী লাগছিল। কিন্তু যেই আমাকে স্কুলে পৌঁছে দিয়ে বাড়িমুখো হলো তখনই মনের ভিতর এত কষ্ট শুরু হল যে কান্না আমার আর থামে না। এই ভাবেই ভালো মন্দ মিশিয়ে মর্ণিং স্কুলটা পার করে দিলাম।

এরপর আমার দ্বিতীয় নম্বর এবং আরেকটা বড়ো উৎসাহ ছিল, আমি ডে স্কুলে যাবো। আমার কাছে মনে হতো, ডে স্কুলে যাওয়া মানে অনেক বড়ো হয়ে যাওয়া। বাচ্ছাদের মতো আর ফ্রক নয়, এবার স্কার্ট পরে স্কুলে যাবো। বাবা মা আর বেশি বকাবকি করবে না। অনেকক্ষণ টি.ভি. দেখতে পাবো, যেমন দিদিরা দেখে। এ সমস্ত একরাশ ভাবনা দিয়ে ডে স্কুলে তো গেলাম। স্কার্ট ও পরলাম, কিন্তু কই? তত মজা তো হলো না। উল্টে কাঁধে কাজের ভারটা আরও বেড়ে গেল। সকালে উঠে খেয়ে দেয়ে স্কুল বাড়ি ফিরে খেয়ে টিউশন, তারপর আবার বাড়িতে পড়তে বসা, রাতে খেয়ে ঘুম। ব্যাস এই ছিল সারাদিনের রুটিন কার্টুন দেখার সময়টুকুই তো হারিয়ে গেল।

আমার তৃতীয় নম্বর এবং খুব উৎসাহের আরেকটা আকর্ষণের কেন্দ্র ছিল নিজের পছন্দের বিষয়গুলো নিয়ে একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে পড়া, নিজেকে নিজেই বলতাম মাধ্যমিক পর্যন্ত একটু কষ্ট করে নিলেই শুধু শান্তি আর শান্তি, বড়োদের মতো শাড়ি পড়ে স্কুলে যাবো। একা একা স্কুল যাতায়াত করবো, বাবা হাত খরচা দেবে, ইচ্ছেমতো সিঙ্গারা, ভেলপুরি খাবো, সবচেয়ে বড় কথা হাতে স্মার্ট ফোন পাবো, এর থেকে বেশি খুশি আর কী হয়? এটাই তো আসল স্বাধীনতা। হ্যাঁ আমি একাদশ শ্রেণিতে পছন্দের বিষয়গুলো নিয়েই ভর্তি হলাম। শাড়ি পড়েই স্কুল গেলাম এবং হাতে ফোনও পেলাম। কিন্তু সবটা যেমন বাঁধনছাড়া আনন্দ ভেবেছিলাম সেরকম তো একেবারেই নয়। উপরন্তু বয়স বেড়েছে বলে অনেক কিছুতেই বাধা পড়েছে। যথা, রাত করে বাড়ি ফেরা, ইচ্ছেমতো মাঠে খেলতে যাওয়া, কোনো জিনিস নিয়ে বায়না করা। এরকম আরো অনেক কিছু, একাদশ শ্রেণিতে একই উড়লেও সামনে উচ্চমাধ্যমিকের চাপ, পছন্দের কলেজ, পছন্দের বিষয় নিয়ে ভর্তি হতে পারবে কিনা সেই চিন্তাগুলো মাথায় এত চেপে বসেছিল যে, ওইসব আনন্দগুলো বড্ড ফিকে লাগত।

তখন মনকে সান্ত্বনা দিলাম; কি হয়েছে, সামনেই তো কলেজ, একবার চান্স পেয়ে গেলে আনন্দই আনন্দ। রঙিন রঙিন জামা পরে কলেজ যাবো। দিদিরা বলে ইচ্ছমতো সময়ে বাড়ি ফিরে আসা যায়। উফ্‌ফ এত আনন্দ, যেন রঙিন স্বপ্নের জগৎ, কলেজ ভর্তি হলাম। শত বাধাবিপর্যয় কাটিয়ে এখন রঙিন জামা কাপড় পড়ে কলেজও আসি। ইচ্ছমতো, প্রয়োজন মত বাড়িও আসতে পারি। উফ্‌ফ এত আনন্দ যেন রঙিন স্বপ্নের জগৎ। কলেজে ভর্তি হলাম। শত বাধাবিপত্তি কাটিয়ে এমন রঙিন জামাকাপড় পড়ে কলেজও আসি। ইচ্ছেমতো প্রয়োজন মতো বাড়িও আসতে পারি। কিন্তু এইদিকে এতদিনে আমার বয়স আঠারো পেরিয়ে উনিশ হয়েছে। এই সমস্ত আনন্দতে আনন্দ পাওয়ার সময় আর নেই। ভবিষ্যত নিয়ে ভাবতে হবে। যারা এতদিন আমার দায়িত্ব পালন করেছে তাদের দায়িত্ব নিজের কাঁধে তুলে নেওয়ার ও সর্বোপরি নিজের দায়িত্ব নিজে নেওয়ার সময় এগিয়ে আসছে। এবার সমস্ত মনোযোগটা সেইদিকে দিতে হবে। অনেক সময় মনে হয় একটা চাকরি পেয়ে গেলে সত্যি খুব স্বাধীন হবো। সত্যি খুব মজা হবে। কিন্তু তখনই নিজেকে বোঝাই, 'কবে স্বাধীন হবো'? আর কবে সত্যিকারের আনন্দ হবে? এইটা ভাবতে ভাবতে তো নিজের শৈশবটা আর কৈশোরটা উপভোগই করতে পারলাম না। এখন তো আগে যৌবনটাকে উপভোগ করি। তারপর স্বাধীনতা আসবে কিনা দেখা যাবে। নয়তো পরে আবার এই সময়টার জন্য আফসোস করতে হবে।

পারমিতা

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়

সৌমী ঘোষ
প্রাণী বিদ্যা, ষষ্ঠ সেমিস্টার

ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায় একজন স্বনামধন্য ভারতীয় ভারতীয় চিকিৎসক ছিলেন। ১৯৭৮ সালের ৩রা অক্টোবর তিনি ভারতবর্ষ তথা এশিয়ার সর্বপ্রথম চিকিৎসক বিজ্ঞানী হিসেবে এক নলজাত শিশু অর্থাৎ টেস্ট টিউব বেবির জন্ম দিয়ে ইতিহাস স্থাপন করেন। ওই শিশুটির নাম ছিল দুর্গা। ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক প্যাট্রিক স্টেপটো ও রবার্ট জিওফ্রি এডওয়ার্ডস দ্বারা পৃথিবীর প্রথম নলজাত শিশু লুইস জন ব্রাইসের জন্ম হওয়ার ৬৭দিন পর ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণায় দুর্গার জন্ম হয়। কিন্তু আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে তাঁর গবেষণার সম্বন্ধে বক্তৃতা দিতে চাইলে পশ্চিমবঙ্গ সরকার তাঁকে বিদেশে যাওয়ার অনুমতি দিতে অস্বীকার করে। এবং এই গবেষণার স্বীকৃতি প্রদান যা করে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্যদপ্তর তাঁর গবেষণার সত্যতা সম্বন্ধেই সন্দেহ প্রকাশ করেন এবং পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করে। সুভাষের সমস্ত গবেষণা মিথ্যা বলে এই কমিটি রায় দেয়। শাস্তিস্বরূপ সুভাষকে রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অব অপথ্যালমেলজি নামক প্রতিষ্ঠানের চক্ষু বিভাগে স্থানান্তরিত করে দেওয়া হয়। ফলে প্রজনন শরীর বিদ্যা সম্বন্ধে সমস্ত গবেষণা তাঁকে বন্ধ করে দিতে হয়। চিকিৎসক সমাজ দ্বারা ক্রমাগত বিদ্রুপ ও অপমানে হতাশ হয়ে তিনি ১৯৮১ সালে কলকাতায় নিজের বাসভনেব আত্মহত্যা করেন।

পরবর্তীকালে টি.সি. আনন্দ কুমারের গবেষণার ফলে ১৯৮৬ সালে হর্ষবর্ধন রেড্ডিঁ বরিঁ জন্মগ্রহণ করলে তাঁকে আনুষ্ঠানিক ভাবে প্রথম নলজাত শিশু বলে গণ্য করা হয়। ১৯৯৭ সালে তিনি কলকাতা শহরে অনুষ্ঠিত একটি বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে যোগ দিতে এলে সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের গবেষণার নথিগুলি তাঁর হতে আসে। তিনি তা যাচাই করেন ও দুর্গার পিতামাতার সঙ্গে আলোচনা করে নিশ্চিত হন যে ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ই ছিলেন প্রথম নলজাত শিশুর স্রষ্টা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরকে পাঠানো গবেষণা সংক্রান্ত সুভাষের চিঠির কথা তিনি সংবাদ মাধ্যমে প্রচার করেন। ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের হাতে জন্মানো দুর্গাকে দেশের প্রথম টেস্টটিউব বেবি হিসেবে মেনে নেওয়ার অর্থ ডাঃ আনন্দকুমারের গবেষণালব্ধ হর্ষকে আর দেশের প্রথম নলজাত শিশু বলে মেনে নেওয়া হবে না। তবুও ডাঃ আনন্দকুমার এগিয়ে এসেছিলেন ডাঃ সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে তাঁর যোগ্য স্বীকৃতি দিতে।

এভাবেই সবক্ষেত্রেই যতই বাধা বিপত্তি আসুক না কেন শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয়। সত্যকে কোনদিন মিথ্যা চাপা দিয়ে রাখা যায় না। কিন্তু দুঃখ এই, সত্য আরও আগে প্রকাশিত হলে এত বড় মাপের একজন চিকিৎসককে আত্মহত্যা করতে হত না।

সমাজের এই নীতি

সহেলী সাঁধুখা
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

ছোটো বেলা থেকেই আমরা প্রায় প্রত্যেকেই কম-বেশি শুনে আসছি মেয়ে হয়ে জন্মানো নাকি 'পাপ'। মেয়ে হয়ে জন্মানো নাকি 'কলঙ্ক'। কী অদ্ভুত না! ভাবতেও অবাক লাগে আবার আমরাই গলা উঁচু করে বলি আমাদের সমাজ উন্নত। এই আমাদের সমাজের নমুনা। ব্রিটিশ আমলের যুগে এই মনোভাবগুলো ছিল। আমাদের দেশ স্বাধীন হয়েছিল ১৯৪৭ সালে - এটা আমরা প্রায় প্রত্যেকেই জানি। কিন্তু দেশ স্বাধীন হলেও আজও এই একবিংশ শতাব্দীতে দাঁড়িয়ে আমাদের মনোভাব কিন্তু এতোটুকুও পাল্টায়নি। কিন্তু যতই সমাজ মেয়েদের লঘু চোখে দেখুক না কেন প্রত্যেক বাবা-মার কাছে তাদের সন্তান হয় খুব আদরের একমাত্র বাবা মায়ের কাছে ছেলে মেয়েরে কোনো ভেদাভেদ থাকে না। এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে প্রত্যেক বাবার কাছে তার কন্যা হয় রাজ কন্যার থেকে কোনো অংশে কম নয়। আর এই কন্যা সন্তানকেই আমাদের দেশের কয়েকটা নিম্ন মনের মানুষের জন্য সমাজ এতটা অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। একটু বাইরের জগতের দিকে চোখ মেলে তাকালেই দেখতে পাব যে, ছেলে ইঞ্জিনিয়ার, ডাক্তারর অথচ তাদের বাবা-মাকে তারা বৃদ্ধাশ্রমে রেখে এসেছে কেন? এই কেনর উত্তর আজও ধোঁয়াশা। অনেকে বলে বয়স হলে বাবা-মা নাকি বোঝা হয়ে যায় ছেলে মেয়েদের কাছে এই হচ্ছে আমাদের সমাজ। আর একজন মা যখন ১০ মাস ১০ দিন সন্তানকে গর্ভে ধারণ করে পৃথিবীর আলো দেখায় তখন একজন মায়ের এতটা কষ্ট হয় – তা একজন 'মা' ই জানে। জন্ম দেওয়ার পরেও অনেক মাকে শুনতে হয় 'কন্যা' সন্তান 'মেরে ফেলো'। আজও আমাদের এই সমাজ প্রতিনিয়ত হচ্ছে। ছি ধিক্কার জানাই এই সমাজকে। আর এই সমাজই গলা উঁচু করে তোলে - ''Our Society is very educated and advanced'' এখন সমাজে আরও একটা নতুন রীতি দেখা যাচ্ছে রাস্তায় কোনো মানুষ বিপদে পড়লে সেখানে লোক জড়ো হয় ঠিকই কিন্তু অর্ধেক মানুষ selfie তুলতেই ব্যস্ত থাকে। এই ফটো গুলো সোসাল মিডিয়ায় upload করাটাও কিছু মানুষের প্রধান উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়। এই হচ্ছে আমাদের সমাজ। যেখানে মানুষের প্রতি মানুষের কোনো সহানুভূতি নেই। এই সমাজ সেদিনই সার্থক ভাবে গড়ে উঠবে সেদিন সবাই একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল হবে, যেদিন সবাই সবার বিপদে ঝাঁপিয়ে পড়বে। সেদিন ছেলে মেয়েকে আলাদা চোখে দেখা যাবে না, যেদিন প্রত্যেক সন্তানদের কাছে মা-বাবা, বোঝা হয়ে উঠবে না, যাদের ঠিকানা হবে না 'বৃদ্ধাশ্রম' সেদিনই স্বাধীন হবে এই দেশ। আরও একবার নতুন ভাবে, নতুন রূপে। এই কামনা করি।

Heal The World

Shreya Basu
Bio General, Sem. IV

"To do something however small, to make the world happier and better is the highest ambition, the most elevating hope which can inspire a human being"

– John Hubbock

The world is the place where we were born, where we live and it is where we are going to die one day. This world is the biggest treasure we have. We call the world "Mother Earth". The word 'Mother' itself proclaim the relationship between us and the world.

But do we give her the dignity, the respect and the privilege of a 'mother' ? Are we not ashamed of ourselves for torturing and destroying the beauty of our 'Mother Earth'.

Various evils have raised their ugly heads everywhere leaving the earth sick and bleeding.

Terrorism, pollution, greed deforestation, feelings of bitterness, hatred, intolerance are the root causes leading to violence, classes and wars. These should be replaced by love and compassion, feeling of brotherhood. kindness and selfless and dedicated service for a good cause. But are we taking any initiative to 'heal the world' of all diseases ?

Oren Amold says,

'Let us give:
To our opponent-tolerance
To a friend-your heart
To all-charity
To every child- a good example
To ourselves-respect.
And to the world-love and dignity'

In this pandemic situation, there is no peace in the world. Let the world get maximum amount of love and be relieved of all its suffering and pain. Let the people awake from their slumber and heal the wounds of Mother Earth.

Heal the world
Make it a better place
For you and for me
And the entire human race ...!!!

Astronomy, Vedic & Ancient India

Snigdha Singh
Physics Hons, Sem - VI

Vedic era denotes before 5th Century BC Vedas are the oldest sacred texts born around 5000 years ago during transition of the world from Neolithic age to bronze age. At that time there was no storage medium. The only surviving of text of vedic period is 'Rig veda' and 'Yajur Vedanga Jyotisha'. It is mentioned in Vedas that when universe originated there were three lights (jyotis) 'Agni', 'Vayu and Aditya'. Then 'Rigveda' originated from 'Agni' 'Yajurveda' from Vayu and 'Samveda' from 'Aditya' Veda is all about ritual, revelation, philosophy, prayer etc.

Astronomy is the branch of science which deals with celestial objects, space and the physical universe as a whole. Mention of astronomy in India dates back to second millennium BC and is found in Vedas. In ancient India astronomy was developed as a 'Vedanga' or a subject to study Vedas. Also in Ancient India astronomy and astrology were considered similar.

The need for astronomy were to keep track of seasons by farmer. Astronomy was used to determine the right time for rituals and thus helped in making calendars. It was also used to determine the right time for marriages etc. It was also used in altar construction.

Ancient India had great mathematicians and astronomers. Lagadha explained aspects of time, seasons, lunar mouth, solar month and their adjustment by 'adhikama' or leap mouth.

Aryabhatta explained in his Aryabhatiya motion of planets to be elliptical and rotation of earth on its axis which led to apparent west ward motion of stars. He also explained the spherical shape of earth and that moon shines due to reflected light of sun. Bhaskaracharya found light of terrestrial objects, 'Surya Sidahanta' was written in Gupta Period (5th Century). Other astronomers include Varahamihir, Brahmagupta etc. The oldest device of astronomy made by Indian were 'genomics'.

In Ancient India Vedas delivered the secrets of astronomy 'Rigveda' describes the universe as infinite. Vedas had account of 7 celestial bodies (not 9) which moved round the sun just like a garland and was called suryamalika and it gave the Heliocentric idea. In Veda stars are called 'nakshatras' (na = no, shatra = power) which means they lost their power to the sun. The closest star to the earth is 'Proxima Centauri' which was named 'mitra' (friend) long ago in Vedas, A quote from Vedas "Sarva dishanaam Suryaaha, suryaha, suryaha" – which means stars are present in every direction in universe . The largest and brightest star 'Antares' of Scorpios

constellation was named as 'Jeshta' long ago in Vedas. 'Some' or moon is considered very important in 'Rigveda' due to its creative function in tides, menstrual cycle and growth of plant. In 'Atharvaveda', there is a quote – "Chandra madhi Krishnam" – which says that the sail of the moon is black. It was realised by modern science only when astronauts landed on moon. In Vedas earth is named as 'Bhugal' which means something which is round and 'Jagat' meaning something that moves. It shows Vedas had clear idea of shape and relation of earth. Vedas have mention of gravity as Gurutvaakarshau where Guru means sun which attracts other planets towards it. The Bhagwat Gita had explained relativity by its quote.''सहस्र युग अहरियद ब्रह्माम्नोंविद्ध'' which says one day of Brahma is equal to many days of earth. Hence it explained relativity of time in different frames. The vedic rishis used 108 beads in a garland for meditation. According to them it was like making a symbolic journey from earth to sun. Modern astronomy proved the distance of earth from sun is about 108 times the diameter of sun. The vedic temples had 54 steps which is half of 108 and thus these temple were simply symbolic representation of cosmos.

Ancient Indian astronomy couldn't advance much due to lack of modern instruments like telescope. But the enrichment of scientific facts in Indian Ancient astronomy made it way ahead of astronomy of other countries. The modern world astronomy agreeing with the old age Vedas leaves us wonder struck. In order to make vedas acceptable to commoners it had account of direct transmission from God. It was also made lyrical to make it interesting, Even after many years of stagnant research, India is catching up with leaders of space and technology.

সালিহুণ্ডাম-বৌদ্ধধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নতাত্ত্বিক স্থানে ভ্রমণ

ড. জনা বন্দ্যোপাধ্যায়
অধ্যাপিকা, সংস্কৃত বিভাগ

অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলাম শহর থেকে নয় মাইল দূরে সালিহুণ্ডাম গ্রামটি বংশধারা নদীর দক্ষিণ তীরে অবস্থিত। এখানে উঁচু পাহাড়ী ভূমিতে Archaeological Survey of India দ্বারা সংরক্ষিত বৌদ্ধস্তূপগুলো বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাভ করেছে। এটি বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান। ১৯১৯ সালে গিদুগু ভেঙ্কট রামমূর্তি খনন কার্যের মাধ্যমে সালিহুণ্ডামের বৌদ্ধস্তূপগুলি আবিষ্কার করেন। খননকার্যের ফলে ধাপে ধাপে বিস্তৃত বৌদ্ধস্তুপগুলো লক্ষিত হয়। ২০১৮ সালের অক্টোবরে ওখানে গিয়ে বৌদ্ধস্তূপগুলো প্রত্যক্ষ করার সুযোগ ঘটে। ওখানকার ASI বোর্ড থেকে জানতে পারি যে, খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রীষ্টিয় সপ্তম ও অষ্টম শতকের মধ্যে বজ্রায়ন তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতাদর্শ ওই অঞ্চলে বিশেষ বিস্তার লাভ করে এবং বৌদ্ধস্তূপ সমূহ নির্মিত হয়। এখানে মারীচি, তারা প্রভৃতি বৌদ্ধতন্ত্রের মূর্তিসমূহ খননকার্যের দ্বারা আবিস্কৃত হয়েছে, যেগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব অনস্বীকার্য। এখানকার সংগ্রহালয়ে মারীচি, তারার মতো আরো কিছু উল্লেখযোগ্য স্থাপত্যের নিদর্শন লক্ষিত হয়। স্থাপত্যগুলি শৈল্পিক দক্ষতা চমৎকার। বৌদ্ধধর্ম দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতকে ওই স্থানে গভীরভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ওখানকার ASI বোর্ড থেকে জানতে পারি সালিহুণ্ডামের বৌদ্ধস্থাপত্যে উত্তর ও দক্ষিণী শিল্পকলার সুন্দর মিশ্রণ ঘাটে। সালিহুণ্ডামে আবিষ্কৃত স্থাপত্যগুলো দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যবর্তী সময়ের। এগুলো বৌদ্ধধর্মে প্রসারের বিভিন্ন সময়ে গড়ে ওঠা মহাযান, থেরাবাদও বজ্রায়ন মতবাদকে সূচিত করে।

বৌদ্ধধর্মের একটিগুণ হল এই ধর্ম প্রচারিত হওয়ার সময় কোন এলাকার স্থানীয় ও নিজস্ব সাহিত্য, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে আঘাত করে না, বরং নীতিগত আদর্শ দিয়ে লালন করে। তাই ধর্মের দোহাই দিয়ে স্থানীয় সাহিত্য, সংস্কৃতি ধ্বংস করা বৌদ্ধধর্মালম্বীরা পছন্দ করেন না। প্রাচীন ভারতে বৌদ্ধধর্ম যেমন বিশাল আকারে বিস্তার লাভ করেছিল, তেমনই বৃহত্তর ভারত তথা দক্ষিণপূর্ব এশিয়ার সুমাত্রা, জাভা, লাওস, থাইল্যাণ্ড, কম্বোজ, মালয়, চম্পা, মায়ানমার, প্রভৃতি দেশেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষিত হয়। সম্রাট অশোকের অধীনে মৌর্যসাম্রাজ্য ছিল পৃথিবীর সবথেকে শক্তিশালী বৌদ্ধরাষ্ট্র। সম্রাট অশোকের কালেই বৌদ্ধধর্ম পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোতে ছড়িয়ে পড়ে। পালিসূত্র থেকে জানা যায় সম্রাট অশোকের কিছু প্রতিনিধি গ্রীক বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন, যাঁরা দুই উপমহাদেশের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদান প্রদানের ভূমিকা রাখতেন। বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে বণিক সম্প্রদায়ের উত্থান ও প্রসার লাভ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। অষ্টম নবম শতকে

অন্ধ্র-উড়িষ্যার সীমাস্থিত বন্দর থেকে বাণিজ্য জাহাজ দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় যেত। অন্ধ্র-উড়িষ্যার সীমানায় এরকমই একটি অন্যতম প্রাচীনবন্দর ছিল কলিঙ্গপতনম। সেন্ট্রাল জাভার বরবুদরের মন্দিরে লক্ষিত ভারতীয় বাণিজ্য জাহাজের স্থাপত্যের ছবিটি অন্ধ্রপ্রদেশের বিশাখাপত্তনমের বিশাখা মিউসিয়ামেও দৃষ্ট হয়। বৌদ্ধসাহিত্য 'সিউকি' তে উড়িষ্যার অনেকগুলো বন্দরের কথা উল্লিখিত আছে। 'বালিযাত্রা' উৎসব উড়িষ্যায় অনুষ্ঠিত হয়, যেখানে কার্তিক মাসে বিবাহিতা মহিলারা পানপাতা, ফুল ফুল বিবিধ উপকরণসহ সাজিয়ে বণিকদের নিরাপদ যাত্রার জন্য প্রদীপ জ্বালেন। এই একই রকম প্রথা বালিতেও লক্ষিত হয়। সমুদ্র উপকূলবর্তী উড়িষ্যার প্রাচীন বাণিজ্য যাত্রার স্মৃতি স্মরণ করে পূজার আচারও পালিত হয়। কার্তিক মাসে উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলে উঁচু পিলার ও বাঁশের ওপর লাইট হাউসের প্রতীকরূপে আকাশপ্রদীপ জ্বালানো হয়। আজও বালিদ্বীপের হিন্দুরা পুরীর মন্দিরে পুজো পাঠাতে আগ্রহী হন। শ্রীকাকুলাম থেকে বত্রিশ কিলোমিটার দূরে বংশধারা নদী মিশেছে বঙ্গোপসাগরে। সমুদ্রতট সংলগ্ন অঞ্চলটিতে কলিঙ্গপতনম নামে যে বিখ্যাত প্রাচীন বন্দরটি ছিল, সেখান থেকে সুগন্ধী, বস্ত্র, মসলাপাতি রপ্তানী হোত। এই বন্দরটি ব্রিটিশ শাসনকালে বন্ধ করা হয়। তবে ওখানে ব্রিটিশরা একটি লাইট হাউস স্থাপন করে। আলপথ, জঙ্গলের রাস্তা পেরিয়ে ওই অঞ্চলের বৌদ্ধ স্তূপটি দেখতে গেছিলাম। কথিত আছে বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্য থেকে ফিরে এরকম স্তূপে অর্জিত ধনসম্পদ লুকিয়ে রাখতেন।

সালিহুণ্ডামের বৌদ্ধস্তূপ ও চৈত্যগুলো দেখে সহজেই বোঝা যায় এটি বৌদ্ধ ধর্মের প্রধান কেন্দ্র হিসাবে কতখানি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। প্রাচীনকালে এই স্থান থেকে বৌদ্ধধর্ম বংশধারা নদী ও কলিঙ্গপতনম সমুদ্র বন্দরের মাধ্যমে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলিতে বিস্তার লাভ করেছিল। বৌদ্ধধর্মের সুদূর প্রসারী প্রভাব সত্যিই আমাদের বিস্মিত করে।

রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকা'

ড. নির্মাল্য সেনশর্মা
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ

'চির যুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি।
সবুজ নেশায় ভোর করছিস ধরা,
ঝড়ের মেঘে তোরই তড়িৎ ভরা,
বসন্তেরে পরাস আকুল-করা
আপন গলার বকুলমাল্য গাছা
আয় রে অমর, আয় রে আমার কাঁচা।' –

'বলাকা' কাব্যের প্রথম কবিতায় কবি সাদর অভ্যর্থনা জানিয়েছেন যৌবনকে, যৌবনের গতিময়তাকে। কবিতাটি লেখা শান্তিনিকেতনে, ১৩২১ সালের ১৫ই বৈশাখ। আবার 'সবুজের অভিযান' নামে সবুজপত্রে এর প্রকাশ ১৩২১এর বৈশাখে। যৌবন তার চলার বেগে প্রকাশ করে জীবনের পরিচয়, দেখে নিতে চায় সবকিছুকে ভেঙ্গে চুরে।

পঁয়তাল্লিশটি কবিতার ডালি নিয়ে সাজানো 'বলাকা' কাব্য, যার প্রকাশ ১৩২৩ এ। পূর্বনির্দিষ্ট পথ থেকে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা-অনুভূতি আর কল্পনা নতুন পথে যাত্রা করেছে বলাকা থেকেই। ১৩২১ এ রচিত হয়েছিল বলাকার প্রথম চৌত্রিশটি কবিতা, আর ১৩২২ এর কার্তিক থেকে পরবর্তী বৈশাখের মধ্যে রচনা হয়েছিল শেষের এগারোটি কবিতা।

বলাকা কাব্য থেকে রবীন্দ্র কাব্যধারায় সূচনা একটা নতুন যুগের। 'তুমি-আমির লীলারসে' মগ্ন কবি 'আধ্যাত্মিক ভাব ও অনুভূতির' জীবনযাপন করেছেন খেয়া থেকে আরম্ভ করে গীতালি পর্যন্ত। কবি-মনকে আবার আকৃষ্ট করেছে মানব-মানবীর হাসি-কান্না, প্রকৃতির রূপবৈচিত্র্য। আধ্যাত্মিক জগৎ থেকে কবি সাগ্রহ দৃষ্টি দিয়েছেন পৃথিবীর প্রতি, নতুন দৃষ্টিভঙ্গি, নতুন ভাব-কল্পনার ঐশ্বর্য নিয়ে ফিরে এসেছেন মানুষ আর প্রকৃতির রূপ ও রসের জগতে - 'মানসী হইতে ক্ষণিকা পর্যন্ত কবির যে রূপ-রসের জগৎ প্রকৃতির মানবের সৌন্দর্য-মাধুর্য প্রেমের জগৎ- সে জগৎ হইতে বলাকার জগৎ একটু ভিন্ন প্রকৃতির। পূর্বের জগৎ প্রত্যক্ষ অনুভূতির জগৎ, ধরণী ও মানব-জীবনের রূপচেতনার অকপট, প্রত্যক্ষ প্রকাশের অনাবিল রসোচ্ছল জগৎ-একান্তভাবে কাব্যের জগৎ; আর

বলাকার জগৎ, প্রকৃতি ও মানবের সত্যকার গভীর রহস্য ও তাহাদের রূপরসের প্রকৃত তত্ত্বানুভূতির জগৎ - বিশেষভাবে কাব্য-দর্শনের জগৎ।'১

'বলাকা' কাব্য সৃষ্টির আগে রবীন্দ্রনাথ ইউরোপ-আমেরিকায় ভ্রমণ করেছিলেন, পেয়েছিলেন সেখানকার বিপুল জীবনযাত্রার আভাস - '... মানুষের তিনি কবি; মানবতার যে ধারাটা আমাদের দেশে প্রবাহিত, যাঁহার কূলে তিনি মানুষ, তাহা ক্ষীণস্রোত, প্রাণরসবেগ তাহাতে অতি মন্থর; একদিন যাহা মহানন্দ ছিল, ইহা তাহার শুষ্কাবেশ মাত্র । এ ই মানবতার প্রবলতম ধারাটা আজ ইউরামেরিকায় বহিতেছে; সেই বিরাট বেগবান স্রোত কবি প্রত্যক্ষ করিয়া আসিলেন, তাহার প্রচণ্ড প্রবাহ তাঁহার শিরা-উপশিরাকে অভিষিক্ত করিয়া দিল। বলাকা যথার্থ ভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের এই বিরাট জীবনপ্রবাহটাকে পাঠকের চিত্তের পটভূমিতে রাখা আবশ্যক। কারণ এই ভাবটা স্বয়ং কবির কল্পনায় সর্বদা অলক্ষ্যে কাজ করিতেছে।'২

দেখা গেছে 'বলাকা' কাব্যে আবেগের দৃষ্টির চেয়ে বৈজ্ঞানিক প্রজ্ঞায় ঘটেছে জীবন-দর্শনের প্রকাশ। এখানে জীবানুভবের রূপায়ণ কোন বিশেষ গোষ্ঠীর ধারণার মাপকাঠিতে বা ভাবের আচ্ছন্নতায় নয়, সামগ্রিক বিশ্বচেতনার নিরিখে, জাগ্রত জীবনবোধের উজ্জ্বল আলোয়। মানুষের জগতের অঙ্গনে কবি এলেন জীবনের স্ফূর্তি নিয়ে নতুন প্রবলতায় ও বিপুলতায়। প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে 'বলাকা'র কবিতাগুলি রচনা শুরু করেছিলেন বলে কবি নিজেই উল্লেখ করেছেন- 'এই কবিতাগুলি প্রথমে সবুজপত্রের তাগিদে লিখতে আরম্ভ করি। ..... তখন আমার প্রাণের মধ্যে একটা ব্যথা চলছিল এবং সে সময়ে পৃথিবীময় একটা ভাঙ্গাচোরার আয়োজন হচ্ছিল। .... এই কবিতাগুলি ধারাবাহিকভাবে একটার পর একটা আসছিল। হয়তো এদের পরস্পরের মধ্যে একটা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। এই জন্যই একে 'বলাকা' বলা হয়েছে। হংস শ্রেণীর মতনই তারা মানসলোক থেকে যাত্রা করে একটি অনির্বচনীয় ব্যাকুলতা নিয়ে কোথায় উড়ে যাচ্ছে।'৩

বলাকা কাব্যের কবিতাগুলি রচনার প্রেরণা হিসেবে যে তিনটি কারণে উল্লেখ আলোচকদের লেখায় পাই তা হল কবির বিদেশ ভ্রমণ, কবির নোবেল পুরস্কার লাভ ও প্রথম মহাযুদ্ধ। কবির মননে-চেতনায় এক প্রবল আলোড়নের সৃষ্টি করেছিল ইউরোপ-আমেরিকার নবজীবন প্রবাহের প্রাণশক্তি ও বিজ্ঞান-রাষ্ট্র-সমাজচিন্তা। সমালোচক বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে কয়েকটি ভাবধারার প্রকাশ লক্ষ্য করেছেন-

' ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি।
খ) মানবজীবনে গতির অনুভূতি ও গতির প্রতীক যৌবনের জয়গান।
গ) ভগবানের লীলা রহস্যের অনুভূতি।'৪

'বলাকায় দেখা গেছে বিশ্ব-প্রাণের প্রকাশ চলমানতায়, গতিতে-আর জীবনের প্রকৃত পরিচয় যৌবনের গতিবেগের মধ্যেই। গতিচেতনার কথা রয়েছে- বলাকার বহু কবিতায়। ফরাসী দার্শনিক

বের্গসঁর বিখ্যাত বই 'Creative Evaluation' প্রকাশিত হয় বলাকা রচনার কয়েক বছর আগে। বের্গসঁ-র মতানুযায়ী নিরন্তর পরিবর্তন চলছে জগতের মধ্যে। রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা'র গতিবাদের আলোচনা প্রসঙ্গে একদিকে বের্গসঁ-র ভাবনা, অন্যদিকে ভারতীয় উপনিষদিক চিন্তাধারার কথা এখানে এসে যায়। নিরবিচ্ছিন্ন গতির বেগের কথা বের্গসঁ বলেছেন। গতির কথা সত্য বলে মেনেও কেবল উদ্দেশ্যহীন অফুরন্ত চলাই নয়, গতিকে স্বীকার করে নিয়ে রবীন্দ্রনাথ উপনীত হয়েছেন এক বিশেষ লক্ষ্যে গিয়ে। বের্গসঁর গতি কোন লক্ষ্য দ্বারা নির্ধারিত নয়, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের যাত্রা আনন্দরসের অন্বেষণে। রবীন্দ্রচেতনায়, রবীন্দ্রভাবনায় এই অবিরাম গতি সত্যের চরম রূপ নয়, একটা দিক মাত্র। স্থিতি-গতির মিলনই যথার্থ রূপ। গতির মধ্যে একটা পরিণাম ও উদ্দেশ্য দেখেছেন 'মিস্টিক ও লীলাতত্ত্বরসিক রবীন্দ্রনাথ'। শব্দের ঐশ্বর্যে আর ছন্দের সুষমায় 'বলাকা' কাব্যে এই গতিশীল বিশ্বপ্রকৃতির রূপ সৃষ্টি করেছে এক অপূর্ব সৌন্দর্যের।

সবুজপত্রে ১৩২২ এর কার্তিকে প্রকাশিত হয় 'বলাকা' নামের কবিতা, যা বলাকা কাব্যের ৩৬ সংখ্যক কবিতা। এখানে বিশ্বপ্রাণের মাঝে যেন স্পন্দিত হয়ে উঠেছে- হংস বলাকার গতিশীলতা ও পাখার চাঞ্চল্য-

'মনে হল, এ পাখার বাণী
দিল আনি
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ।
পর্বত চাহিল হতে বৈশাখের নিরুদ্দেশ মেঘ,
বাজিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে -
'হেথা নয়, হেথা নয়, আর কোন্ খানে।'

কবি যেন শুনতে পেলেন 'অস্পষ্ট অতীত' থেকে 'অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে' প্রবাহিত হয়ে চলা মানবের ভাব-ভাবনা, চিন্তা ও বাণী।

চিত্রধর্ম ও সঙ্গীত ধর্মের মিলন ঘটেছে 'বলাকা'র প্রকাশভঙ্গিতে। এক অপূর্ব গতিময়তা দেখা যায় 'বলাকার' ছন্দের মধ্যে। পংক্তিগুলো অন্ত্যানুপ্রাস বর্জিত না হলেও অসমমাত্রিক। ভাবের মুক্তির দ্যোতনা লক্ষ্য করা যায় বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে। সেই মুক্তিই যেন অবারিত অথচ দৃষ্টিগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে ছন্দে সমমাত্রার চরণের শৃঙ্খলকে ভেঙ্গে। 'বলাকা'র ছন্দ যেন এক অপরূপ সৃষ্টি– অসমমাত্রার মিত্রাক্ষর পংক্তি কবির হাতে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠেছে নতুন লালিত্যে।

'বলাকা'র ৪ সংখ্যক কবিতার ব্যাখ্যায় কবি নিজেই জানিয়েছিলেন যখন পূজাকে তাঁর মনে হয়েছিল 'তখনকার একমাত্র কতর্ব্য বলে,' তখন অন্তরে দাবি এসেছিল, মানুষকে আহ্বান করার জন্য শঙ্খ বাজাতে- 'মানুষকে ছোটো গণ্ডী থেকে বড়ো রাস্তায়' ডাকতে হবে 'বিশ্ববিধাতার নামে'৫

'চলেছিলাম পূজার ঘরে
সাজিয়ে ফুলের অর্ঘ্য
খুঁজি সারা দিনের পরে
কোথায় শান্তিস্বর্গ

ভেবেছিলেম যোঝাযুঝি
মিটিয়ে পাব বিরাম খুঁজি।
চুকিয়ে দিয়ে ঋণের পুঁজি
লব তোমার অঙ্ক।
হেনকালে ডাকল বুঝি
নীরব তব শঙ্খ।'

'বলাকা'র ৬ সংখ্যক কবিতার রচনা বিষয়ে সমালোচক চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় পাই 'এই ছবি খুব সম্ভব কবির পত্নীর। তিনি যখন বুদ্ধগয়া হইতে এলাহাবাদে যান, তখন সেখানে তাঁহার ভাগিনেয় সত্যপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের জামাতা প্যারীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ীতে গিয়াছিলেন, সেইখানে বোধ হয় কবি নিজের পত্নীর প্রতিকৃতি দেখিয়া এই কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।'৬

যাঁর ছবি তিনি মৃত। কিন্তু তিনি আর শুধু অচল ছবি নন; একটা গতিময়ী শক্তি। কবিকে প্রেরণা জোগাচ্ছেন – সৌন্দর্য উপভোগ, নানা রকম ভাবনার ও কবিত্বশক্তির, প্রত্যক্ষ চেতনার জগৎ থেকে সরে গিয়েও কবির অন্তরলোকে, হৃদয়ের গভীরে, মগ্নচৈতন্যে অবস্থান করে-

'তুমি কি কেবল ছবি শুধু পটে লিখা?
-ওই- যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড়
আকাশের নীড়,
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী
গ্রহ তারা রবি,

তুমি কি তাদেরি মতো সত্য নয়?
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি?
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই;
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।'

'বালকা'র ৭ সংখ্যক কবিতাটি কাব্যগ্রন্থের অন্যতম শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এতে রয়েছে কল্পনার প্রসারতা, ভাষার রূপৈশ্বর্য আর ভাবের ব্যঞ্জনা। স্মৃতি চিরন্তনত্ব লাভ করে স্মৃতির সঙ্গে ছড়িয়ে থাকা প্রীতিতেই। সত্যের অবস্থান অন্তর-বেদনার মধ্যে, বস্তুস্তূপে নয়। তাজমহল নির্মাণে রয়েছে 'ভারত-ঈশ্বর শা-জাহানে'র অন্তরবেদনার চিরন্তনত্ব লাভের প্রয়াস। অপূর্বসুন্দর তাজমহলের সৃষ্টিতে শা-জাহান তাঁর অন্তর-বেদনা, প্রেমের স্মৃতিকে চিরন্তন করে রেখে যেতে চেয়েছিলেন। তাঁর ইচ্ছা কালের কোলে চিরদিন যেন অমর হয়ে থাকে, শোভা পায়, তাঁর 'পত্নীশোকের এই এক বিন্দু অশ্রু', সৌন্দর্যের অপরূপ প্রকাশ হিসেবে-

'একথা জানিতে তুমি, ভারত-ঈশ্বর শা-জাহান,
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।
শুধু তার অন্তরবেদনা
চিরন্তন হয়ে থাক্ সম্রাটের ছিল এ সাধনা।

হীরামুক্তামাণিক্যের ঘটা
যেন শূন্য দিগন্তের ইন্দ্রজাল ইন্দ্রধনুচ্ছটা
যায় যদি লুপ্ত হয়ে যাক,
শুধু থাক্
এক বিন্দু নয়নের জল
কালের কপোলতলে শুভ্র সমুজ্জ্বল
এ তাজমহল।'

'বলাকা'র ২৯ সংখ্যক কবিতায় যে 'আমি'র কথা বলা হয়েছে, সে 'আমি' হল 'ব্যক্ত জগতের প্রতিনিধি-স্বরূপ।', কোন 'ব্যক্তিবিশেষ নয়'। 'তোমার', সুপ্তি থেকে জাগরণ ঘটল 'আমার' মাঝেই। ঘুম থেকে যেন জেগে উঠল বিশ্ব, প্রকাশ হল তার -

'আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম-

শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দকুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমায় তুমি তারায় তারায় ছড়িয়ে দিয়ে কুড়িয়ে নিলে কোলে।

আমায় দেখবে বলে, তোমার অসীম কৌতূহল-
নইলে তো এই সূর্যতারা সকলই নিষ্ফল।

প্রথম মহাযুদ্ধের সময় লেখা হয়েছিল 'বলাকা'র ৩৭ সংখ্যক কবিতাটি। তখন ধ্বনিত হয়েছে মৃত্যুর গর্জন, লেগেছে 'মরণে মরণে আলিঙ্গন'। কবির অনুভব এই মৃত্যু, এই ধ্বংসলীলা, লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিনাশ, তারও মধ্যে রয়েছে একটা বৃহত্তর, মহত্তর উদ্দেশ্য- নিরর্থক নয় এ মহাপ্রলয়। কবি উপলব্ধি করেছেন, রুদ্রর নতুনকে সৃষ্টি করার জন্য, আয়োজন এ প্রলয়ের। সত্যকে গ্লানিমুক্ত করার জন্যই এ আয়োজন, যখন সত্য ঢাকা পড়েছে মিথ্যা - অন্যায় ও পাপ দিয়ে। নবযুগ- ঊষার উদয় হবে বিক্ষোভের মধ্যে থেকেই - সকলকে সচেষ্ট হতে হবে - আহ্বান করতে হবে সত্য আর ন্যায়কে-,

'তার পরে দাঁড়াও সম্মুখে,
বলো অকম্পিত বুকে
'তোরে নাহি করি ভয়;
এ সংসারে প্রতিদিন তোরে করিয়াছি জয়।
তোর চেয়ে আমি সত্য এ বিশ্বাসে প্রাণ দিব দেখ্।
শান্তি সত্য, শিব সত্য, সত্য সেই চিরন্তন এক।

বীরের এ রক্তস্রোত, মাতার এ অশ্রুধারা,
এর যত মূল্য সে কি ধরার ধুলায় হবে হারা?
স্বর্গ কি হবে না কেনা?
বিশ্বের ভাণ্ডারী শুধিবে না
এত ঋণ?
রাত্রির তপস্যা সে কি আনিবে না দিন?
নিদারুণ দুঃখরাতে
মৃত্যু ঘাতে
মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্তসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা'?

নতুন বছরের শুরুতে (৯বৈশাখ ১৩২৩) লেখা 'বলাকা'র ৪৫ সংখ্যক কবিতা। রচনাস্থান কলকাতা। এখানে সাদর অভ্যর্থনা জানানো হয়েছে নতুন বছরকে, নবযুগের প্রতীক হিসেবে। পুরাতনকে নয়, এখানে কবি আহ্বান জানিয়েছেন নবীনকে। দুঃখের তপস্যার মধ্যে দিয়ে মানুষকে সব রকম জীর্ণতা ত্যাগ করে অমর হতে হয়। মানবজীবনে অনন্তর - অসীমের আবির্ভাব হয় বিপদ-দুঃখ-মৃত্যুর বেশে, যা স্বীকার করে নিয়েই এগোতে হয় নতুনের অভিসারে। পুরাতনের মোহ ত্যাগ করে, কুসংস্কার কাটিয়ে উঠে, নতুনের দিকে এগিয়ে চলবে আলোর পথ-যাত্রী –

'ওরে যাত্রী
ধূসর পথের ধুলা সেই তোর ধাত্রী;
ঘরের মঙ্গল শঙ্খ নহে তোর তরে,
নহে রে সন্ধ্যার দীপালোক
নহে প্রেয়সীর অশ্রুচোখ।

ক্ষতি এনে দিবে পদে অমূল্য অদৃশ্য উপহার।
চেয়েছিলি অমৃতের অধিকার -
সে তো সুখ, ওরে, সে নহে বিশ্রাম,
নহে শান্তি, নহে সে আরাম।
মৃত্যু তোরে দিবে হানা,
দ্বারে দ্বারে পাবি মানা-
এই তোর নব বৎসরের আশীর্বাদ,
এই তোর রুদ্রের প্রসাদ।

সৃষ্টির প্রকৃত রূপই হল চলমানতা। জীবনের মূল বাণীই হল চিরযৌবনের বাণী। বিশ্বের প্রাণশক্তির যথার্থ প্রকাশ আর জীবনের প্রকৃত পরিচয় নিরন্তর গতির মাঝেই পরিবর্তন আর এগিয়ে চলার মাঝেই নিহিত সৃষ্টির সত্যিকারের রূপ। জীবনের অস্তিত্বের পরিচয় নতুনকে বরণ করে নেওয়ার মধ্যে। আর এর মধ্যে দিয়ে ফুটে ওঠে মানুষের জীবনের সত্য। এই ভাব ও অনুভূতির প্রকাশ ঘটেছে বলাকার কবিতাগুলির মধ্যে। বলাকায় পৌঁছে প্রাক-গীতাঞ্জলি পর্বের রূপ ও রসের জগতে আবার ফিরে এলেন কবি। দেখা যায় এখানে মানব-জীবন-ধারায়, বিশ্ব-মানবের চিন্তা ও কর্মের সগৌরব, বলিষ্ঠ ও বিস্তৃত প্রকাশ। 'হংস বলাকা'র কথায় যেমন এসে যায় এক 'গতিধর্মের কথা', তেমনি 'বলাকা' কাব্যেও বর্ণিত বিশ্বের অন্তর্নিহিত 'গতিছন্দের' কথা– 'বলাকা নামটি সংস্কৃত সাহিত্যে সুপরিচিত। বলাকা– পংক্তি যখন আকাশে তোরণহীন লম্বিত মালার ন্যায় দুলিতে দুলিতে

মানস সরোবরের দিকে উড়িয়া চলিয়া যায়, তখন তাহাদের প্রত্যেকের পৃথক ও স্বতন্ত্র মূর্তি আমাদের দৃষ্টিতে তেমন সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় না, যেমন প্রতিভাত হয় তাহাদের সম্মিলিত মালিকাবদ্ধ সমগ্র পংক্তির গতিচ্ছন্দ ও গতিভঙ্গিমা। বলাকার কবিতাগুলির প্রত্যেকেরই এক-একটি স্বতন্ত্র তাৎপর্য তো আছেই, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও তাহাদের সম্মিলিত সমষ্টিফল একটি বিশেষ স্বতন্দ্র তাৎপর্যে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে।'৭

তথ্যসূত্র ঃ

১) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা ৭০০০ ৭৩, ১৪১৬, পৃঃ ৫৫৪

২) প্রমথনাথ বিশী ঃ রবীন্দ্রকাব্যপ্রবাহ, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স, প্রাঃ লিঃ, কলকাতা-৭৩, ১৪১৭, পৃঃ ১৮৬

৩) 'বলাকা', রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা' 'ভূমিকা', বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৭১, পৃঃ ১১৩

৪) উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য ঃ রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা, ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি, কলকাতা - ৭০০০৭৩, ১৪১৬, পৃঃ ৫৬২

৫) বলাকা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক বলাকার ব্যাখ্যা ও আলোচনা' 'ভূমিকা', বিশ্বভারতী, শ্রাবণ ১৩৭১, পৃঃ ১১৭

৬) চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবি-রশ্মি, দ্বিতীয় খণ্ড, দে বুক স্টোর, কলকাতা-৭৩, ১৪১০, পৃঃ ১৫৩

৭) ঐ, পৃঃ ১৩৬

শিক্ষাগুরু

কমলিকা মান্না
মাইক্রোবায়োলজি অনার্স, দ্বিতীয় সেমিস্টার

ছাদের সেই চেনা জায়গাটায় বসে রয়েছে তুলি, সেই জায়গা যেখানে সে তার মন খারাপের প্রতিটা দিন সে কাটিয়েছে, হাতে তার আজকের সদ্য বেরোনো উচ্চ মাধ্যমিকের রেজাল্ট, না তার রেজাল্ট খারাপ হয়নি, সে তার আন্দাজ করা রেজাল্ট এর চাইতেও অনেকটাই বেশি পেয়েছে, বাড়িতে মা-বাবা শিক্ষক-শিক্ষিকা সবাই খুব খুশি, যে মানুষটা নিয়ে আজকের এই খুশির মুহূর্ত শুধু তার মুখেই নেই এক টুকরো হাসি, হাসিখুশি প্রাণোচ্ছল মেয়েটি যেন আজ সকল হাসি ভুলে গিয়েছে। অশ্রুধারা যেন মানছে না কোনো বাঁধন, যতই সে তার মনকে মানাতে চাই তাই যেন তার চোখ বেয়ে নেমে যাচ্ছে মলিন এক টুকরো জলরাশি। দীর্ঘ সাতটি বছরের অপেক্ষার হয়তো এই পরিণতি তার ভাগ্যে লেখা ছিলো। হ্যাঁ দীর্ঘ চারটি বছর.....

তুলি কর্মকার

প্রেজেন্ট স্যাম

সময়টা ক্লাস ফাইভ, নতুন স্কুল, নতুন বন্ধু, সম্পূর্ণ একটা নতুন পরিবেশে বড় হবার শুরু মাত্র। তুলির কাছে সবচেয়ে কঠিন একটি বিষয় ছিল অংক। বলতে গেলে রীতিমত ভয় পেতো অংকের বিষয়টিকে, তবে নতুন স্কুলের নতুন বন্ধুদের সাথে কম্পিটিশনের দরুন প্রথম প্রথম সেও চেষ্টা করেছিল ভালোভাবে বিষয়টিকে বোঝার জন্য, কিন্তু কোথাও যেন একটি ভীতি কাজ করতো তার মনে। কোনরকমে সে তার ক্লাস এইট পর্যন্ত সময়টা পার করে, চিরকালই তার পরিবারের লোকজন পড়াশোনার প্রতি একটু বেশিই কঠিন। ক্লাস নাইনের বার্ষিক পরীক্ষার অবাক করে দেওয়া একটি সাফল্য সে এনে দেয় তার মা-বাবার কাছে, সবথেকে আশ্চর্যের বিষয় এটি ছিল যে, না এবার তাকে অংকে ফেল করতে হয়নি, বরং ক্লাসের সর্বোচ্চ বেশি নাম্বার পেয়ে সে আজ উত্তীর্ণ হয়েছে। এরপর থেকে তাকে আর কোনদিনই এই বিষয়টির প্রতি আর পিছন ফিরে তাকাতে হয়নি। মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক দুটি পরীক্ষাতেই সে একশোয় একশো পেয়ে উত্তীর্ণ হয়। হ্যাঁ এবং আজই উচ্চমাধ্যমিকের তার সাফল্যের আনন্দ তম দিন। কিন্তু কেন তার চোখ বেয়ে এখনো জল ? হয়তো কিছু মানুষ আমাদের জীবনে খুব কম সময়ের জন্য এলেও তারা অনেক বেশি স্মরণীয় হয়ে ওঠে। ক্লাস নাইনের মাত্র পাঁচ মাস সময়ের জন্য জয়েন করা নতুন একটি শিক্ষিকা ছিল মৌসুমী। অন্য শিক্ষিকার মতই তিনিও ছিলেন একজন সাধারণ শিক্ষিকা, কিন্তু তুলির জীবনে তিনি ছিলেন অসাধারণ অসামান্য একজন। সব সময় গতানুগতিক পড়াশোনার গন্ডির মধ্যে আবদ্ধ না থেকে কি

ভাবে বড়ো হওয়া যায় সেটি তার কাছ থেকেই শিক্ষা পায়। অংকের বিভিন্ন ট্রিক দিয়ে কিভাবে এক নিমেষে কঠিন অংক খুব সহজেই সমাধান করে দিতেন সেটি দেখে মুগ্ধ হয়ে যেত তুলি। ক্লাসের বাকী মেয়েদর জিনিসটি খুব একটা আকর্ষণীয় না মনে হলেও তার কাছে এটি অনেক বেশি আকর্ষণীয় ছিল। হয়তো এখান থেকেই তার শুরু হয়েছিল নতুন করে জীবন চলার একটি নতুন পথ। ক্রমশই তার অংকের প্রতি ভালবাসাটা আরো বেশি প্রবল হতে থাকলো। এবং ....হ্যাঁ একটা দিন সে সবাইকে প্রমাণ করে দিল যে সে কোন অংশে কম নয়। দেখতে দেখতে কি করে ছটা মাস কেটে গেল ভাবতেও পারল না। হঠাৎই একদিন স্কুলে এসে শুনতে পায় সে মৌসুমী দি অন্য স্কুলে বদলি হয়ে গেছেন। আকাশে কালো মেঘের পর যেমন ঝরে বৃষ্টি পড়ে পৃথিবীর বুকে এভাবেই হয়তো তার মনের দুঃখের ভার এভাবেই ধরে পড়েছিল সেদিন। তারপর তুলি প্রতিজ্ঞা করে যে সে একদিন তার লক্ষ্য পূরণ করবে।

আজ সে তার লক্ষে উত্তীর্ণ হয়েছে। সময়ের চাকা ঘুরতে ঘুরতে মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিকে সে একশোয় একশো পেয়েছে। যেহেতেু তার প্রিয় শিক্ষিকার সাথে তার কোনো যোগাযোগ ছিল না তাই প্রথমে সে তার প্রথম লক্ষ্য পূরণ এর খবরটি দিতে পারেনি তার প্রিয় মানুষটির কাছে। অনেক খোঁজ খবর নিয়ে স্কুলের শিক্ষিকাদের থেকে ফোন নম্বর পায়। আজ সেই দিন এসেছে, ফোনে অনেকবার চেষ্টা করার পর কেউ একজন ফোন ধরে।

হ্যালো ... মৌসুমী দি ...

কে বলছেন ?

উল্টোদিক থেকে ভেসে এলো। একটি লোকের গলাভাঙা স্বরের উত্তর, বললেন আপনি হয়তো অনেকটা দেরি করে ফেলেছেন, আপনি যাকে খুঁজছেন তিনি গত এক মাস ধরে কোভিড এর কবলে ছিলেন, গতকাল তিনি পরলোক গমন করেছেন। ফোনটা কোনক্রমে টেবিলে রেখে দৌড়ে চলে যায় ছাদের দিকে, বাকরুদ্ধ হয়ে যায় তার, শুধু ধরতে থাকে অঝোরে অশ্রু ধারা তার চোখের নিচে, বিকেলে অস্ত যাওয়া সূর্যের রশ্মি অশ্রুধারাকে আরো বেশি চকচকে করে তোলে। সব অপেক্ষার ফল হয়তো সর্বদা সুমধুর হয় না। সামান্য কিছু সময়ের জন্য কিছু মানুষ কারো জীবনে এলেও তার প্রভাব সারা জীবন থেকে যায়। আবার কিছু মানুষ সারা জীবন পাশে থাকলেও আপন হতে পারে না।

ভাগ্যশ্রী

দ্বীপান্বিতা নন্দী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার

আমি ভাগ্যশ্রী। বাবা বলতো ভাগ্যশ্রী মানে সৌভাগ্য প্রদানকারী দেবী। আমার জন্ম মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে। বাবা ছিলেন গ্রামের পোষ্ট মাস্টার। নিতান্ত ছাপোষা নিম্নমধ্যবিত্ত একান্নবর্তী পরিবারে আর্থিক অনটনের মধ্যেই আমার পরিণত হয়ে ওঠা।

আমাদের পরিবারে আর্থিক অনটন থাকলেও অভাব হয়নি কোনোদিনও শান্তির ও ভালবাসার। বাবা বলতো শ্রী অনেক বড়ো 'হ' মা, মানুষের মতন মানুষ হও। এই দেশের মানুষের পাশে দাঁড়া। সৎ মানুষ 'হ'। আমাদের দেশের বহু মানুষ আজ ও বিনা চিকিৎসায় মারা যাচ্ছে দিনের পর দিন। তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতে হবে তোকে। কারণ এটা যে তোর মাতৃভূমি। বাবার সেই কথাগুলো আজও আমার মনে স্পষ্ট হয়ে আছে ঠিক মোম রঙের আঁকা ছবিটার মতন-ই।

বাবা বলতো শিক্ষাই প্রগতির একমাত্র পথ এই শিক্ষাই পারে সমাজের বন্ধ করে রাখা চোখটাকে উন্মুক্ত করতে। গ্রামের লোকজন যখন রাস্তায় দাঁড়িয়ে বাবাকে জিজ্ঞেস করতো 'মেয়েকে এতো পড়াশোনা করিয়ে কী লাভ? সেই তো পরের বাড়ির হেঁসেল ঠেলতে হবে!!' বাবা তখন সগর্বে সবার সামনে বলতো না আমার মেয়ে যতদিন না নিজের পরিচয় নিজে তৈরী করছে, ততদিন আমি তার অন্যত্র বিয়ে দেবো না। আসে তাদের নিজের পরিচয় তৈরীর সুযোগ দেওয়া হোক, মেয়েরাও যে ছেলেদেরে থেকে সমাজে কোনো অংশে পিছিয়ে নেই তার প্রমান দেবে। মেয়েদের আগে সম্মান করতে শেখো, তারাও মানুষ, তাদেরও নিজস্ব মতামত আছে, সেটাও পেশ করতে দেওয়ার সুযোগ দেওয়া হোক। বাবার সেই ভাবনাকে পাত্তা দেইনি গ্রামের মানুষজন কেউ কেউ তো বলে দিয়েও গেছিল যে, যদি দেখি বিবাহ উপযুক্ত মেয়ের সঠিক সময়ে বিয়ে দিচ্ছো না, তাহলে তোমাদের একঘরে করা হবে, কথাটা মাথায় থাকে যেন।

বাবা গ্রামের সেইসব লোকজনের কথাকে আমল না দিয়ে বরং আমাকে অনেকটা সাহস জুগিয়ে বলেছিল 'ভয় পাস না মা আমি তো আছি তোর পাশে, চিন্তা কী তোর, কিচ্ছু হবে না। ভয়কে জয় করতে শেখ, সাহস দিয়ে না হলে ওই ভয় তোর জীবনকে গ্রাস করবে।' বাবার সেই আদর্শকে সম্বল করেই আমার পথচলা শুরু। এই পথ চলতে চলতে কখনো যদি হাঁফিয়ে উঠতাম বা ভেঙে পড়তাম মনে পড়তো তখন বাবার শেই কথাগুলি। আবারো দ্বিগুন উৎসাহে দৌড়োতাম বাবার আর আমার স্বপ্নপূরণের লক্ষ্যে। আমার চোখে তখন একটাই স্বপ্ন একজন সফল ডাক্তার হওয়া। আমাদের দেশের গ্রামের গরীব মানুষেরা যে বিনা চিকিৎসায় মারা যায় তাদেরকে বাঁচাতে হবেই।

আস্তে আস্তে ক্লাস বাড়লো মাধ্যমিক তারপর উচ্চমাধ্যমিক তারপর জয়েন্ট-এ বসলাম মেডিক্যাল কলেজে পড়ার। সেই প্রথমবার আমার গ্রামের বাইরে পা রাখা। খুব কষ্ট হচ্ছিল আমার বাবা-মা, আমার পরিবার, আমার ভাই-বোন, আমার বাড়ি, আমার স্কুল, আমার স্কুলের সব বন্ধুদের ছেড়ে, আমার প্রিয় পড়ার টেবিলটা ছেড়ে আসতে। শিকড় ছিঁড়ে কোনো গাছকে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় নিয়ে গিয়ে পুঁতলে গাছটার যেমন অবস্থা হয় আমারো ঠিক সেই রকমই অবস্থা হয়েছিল। আমার প্রিয় ছাদের কোণের ঘরটা, আমার পড়ার টেবিল, চেয়ারটা, গল্পের বইগুলো আর প্রিয় মানুষগুলোকে ছেড়ে আসতে, কোলকাতায় এসে কেমন যেন সব এলোমেলো হয়ে গেল, মনে থেকে গুলো সেই স্মৃতিগুলোই। এখানকার আলো ঝলমলে তিলোত্তমা আর আমার গ্রামের মাঝে যে বিস্তর ফারাক সেটা টের পেলাম এখানে এসে, প্রথম প্রথম ইঁট-কাঠে ভরা শহরটায় দমবন্ধ হয়ে আসতো, নিশ্বাস নিতে কষ্ট হতো খুব। কোথায় সেই আমার খোলা আকাশ যেখানে কোনো সীমা নেই অনন্ত যে, ইচ্ছা করলেই হারিয়ে যাওয়া যায় তার মাঝে, কোথায় গেলো সেই পাখির কলরব-সারাদিন তাদের কিচির-মিচির ডাকটাকে হারিয়ে ফেলেছিলাম বোধহয় কোনো বইয়ের পাতায়, পায়ের নীচের সবুজের বার্নিশ বিছানো মাঠটারও অস্তিত্ব নেই এখানে। এখানে সকালে ঘুমভাঙে এলার্মের শব্দে আর আমার গ্রামে প্রতিদিন কাঁসাই পাড়ে শ্যাওলা পরা ভাঙা ঘাটটায় বসে সূর্যোদয় না দেখলে ভালো লাগল না সারা দিনটা। সেই আমির অস্তিত্বটা একটু একটু করে পাল্টাচ্ছিলো রোজ এই শহরে এসে।

কিন্তু এই শহর এই তিলোত্তমাই কিভাবে যে এতোটা আপন হয়ে যাবে বুঝতেও পারেনি। এই কোলকাতা শহরের একটা মায়া আছে, সেই মায়ায় যদি কেউ পড়ে যায়, তাহলে তা থেকে বেরোনো মুসকিল। ক্যালকাটা মেডিক্যাল কলেজে-ই আমার ডাক্তারী পড়ে ডাক্তার হয়ে ওঠার চেষ্টা। এইখানেই কাটিয়েছি জীবনের দীর্ঘ পাঁচটা বছর। এই কলকাতা শহরটা আমার অনেক সুখ-দুঃখ, আনন্দ বিষাদ, জয় পরাজয় সমস্ত কিছুর সাথেই জড়িয়ে আছে প্রতিমুহূর্তে। এখান থেকেই আমার লড়াই শুরু মেয়েদের নিয়ে কাজ শুরু করার। সময়ের সাথে সাথে পথে এগিয়েছি ক্রমোশ। আমরা মেডিক্যাল কলেজের কয়েকজন বন্ধুরা মিলে শুরু করলাম 'নির্ভয়' নামের একটি সংস্থা, যেখানে অসুস্থ, নির্যাতিত, ধর্ষিত নিপীড়িত মেয়েদের নিয়ে আসতাম এবং তাদের ভয় কাটানোর চেষ্টা করতাম, চিকিৎসা করতাম তাদের এবং তাদের থাকার ব্যবস্থা ও স্বনির্ভর হয়ে ওঠার জন্য সাহায্য করতাম বিনামূল্যে। এখন অনেক নির্যাতিত, ধর্ষিত মেয়েরা আছে যাদের সাহায্যের জন্য পুলিশ এগিয়ে আসতো না তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়াতাম আমরা। এমনই এক ঘটনার খবর পেয়ে গেছিলাম বাঁকুড়ার এক গ্রামে। সেখানে এক গরীব মেয়েকে দিনের পর দিন নির্যাতন করা হতো, প্রতিরাতে ধর্ষণ করা হতো তাকে। সেই খবর পেয়েই ছুটেছিলাম তাকে উদ্ধার করতে। অনেক

বাক-বিতণ্ডার পরে ফিরছিলাম তাকে সাথে নিয়েই। স্টেশনের কিছুটা আগেই ফাঁকা মাঠ আর জঙ্গল পড়ে বেশ অন্ধকার ছিল চারপাশ, তার মধ্যেই লাল মাটির রাস্তা হাঁটছিলাম দুজনে কিছু দূর যেতেই নজরে এল হঠাৎ দূর থেকে একটা বাইক আমাদের দিকেই ছুটে আসছে কয়েক সেকেণ্ডের মধ্যেই বাকিটা আমাদের সামনে চলে এল, আমরা দুজন পালাবার চেষ্টা করতেই হঠাৎ জলের মতো কী একটা ছিটকে এসে পড়লো আমার মুখে। অকথ্য যন্ত্রণায় জ্ঞান হারিয়েছিলাম সেদিন। কতক্ষণ পড়ে জ্ঞান ফিরেছে জানিনা, যখন জ্ঞান ফিরল বুঝতে পারলাম সেই গ্রামেরই হাসাপাতালে ভর্তি করেছে গ্রামবাসীরা। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় অজ্ঞান হয়ে যাচ্ছিলাম বারাবার। আবার যখন জ্ঞান ফিরল দেখলাম চোখ খুলে আমার মাথার কাছে বসে আছে আমার মা-বাব, আমার বন্ধুরা। তারপর কতদিন যে হাসপাতালে ছিলাম মনে নেই ঠিক। তারপর যেদিন বাড়ি ফিরলাম গিয়ে দাঁড়ালাম আয়নার সামনে সেদিন মনে হয়েছিল কেউ আমার মুখের সাথে সাথে পুড়িয়ে দিয়েছে আমার অস্তিত্বটাকেও। উঠে দাঁড়ানোর লড়াই করার ক্ষমতাটুকু ছিল না সেদিন। চোখের সামনে দেখেছিলাম কাছের কাছের মানুষগুলোর হঠাৎ পাল্টে যাওয়া বীভৎস রূপটা। আস্তে আস্তে সবাই সরে যাচ্ছিল পাশ থেকে। কেউ কেউ হাঁসাহাসি করে বলে যাচ্ছিল, মেয়েদের উচ্চ শিক্ষিত হলে এমনটাই হয়। শুধু তখন মনে হতো বেঁচে থেকে কী লাভ ? শেষ করে দিই নিজেকে, চেষ্টা করিনি বললে ভুল হবে করেছিলাম চেষ্টা বহুবার কথাগুলোই। ভয় পাচ্ছিস মা তুই, তুই ভয় পেলে আমরা সাহস পাই কী করে, যে মানুষগুলো আজ তোর এই অবস্থা করলো দেখ তারাই আজ স্বগর্বে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আজ যে ক্ষতি তোর করেছে হয়তো কার অন্য কারুর সাথেও .....। তুই তো বলেছিলি ডাক্তার হয়ে ফিরে আসবি সেবা করবি গরীব মানুষ গুলোকে আরো একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছিলাম উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটা। শুরু করেছিলাম লড়াইটা একটু একটু করে। সেই সময়টা শিরদাঁড়া হয়ে দাঁড়িয়েছিল। শিখিয়েছিল অপরাধীদের বিরুদ্ধে লড়তে গেলে লাগে বুদ্ধি আর আহস। এই সাফল্য টা কতটা আমার প্রাপ্য তার থেকে বেশী প্রাপ্য পিছনে দাঁড়িয়ে সাহস যোগাবার মানুষটারও।

সেরা বাঙালী পুরস্কার পাচ্ছেন ভাগ্যশ্রী চ্যাচার্জী। তার নাম মঞ্চে ঘোষণা হতেই করতালিতে ভরে উঠল গোটা হলঘরটা। এতক্ষণ নিশ্চুপ হয়েছিল চারদিকটা। একজন ডাক্তার হিসেবে এবং তার সাথে মেয়েদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রতিষ্ঠান 'নির্ভয়'-এর কর্ণধার ও তিনি। তাই এবারের সেরা বাঙালী পুরস্কারটা তারই প্রাপ্য বললেন আমাদের রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী চারিপাশ থেকে ঝলসে উঠল ক্যামেরার ফ্লাস। আজ সে একজন সফল মানুষ সময় তাকে শিখিয়েছে রূপটাই আসল নয়। রূপ হল বাহ্যিক। আসল সৌন্দর্য্য লুকিয়ে মানুষের অন্দরে। সেই মানুষটারই নাগাল পেয়েছে সে। পেরেছে তাঁর স্বপ্ন ও তাঁর বাবার স্বপ্নপূরণকে পূর্ণাঙ্গ রূপ দিতে।

ভগবান বুদ্ধ

অয়ন্তিকা লাহা

যখন সারা পৃথিবীতে জুড়ে চলছে অস্থিরতা, হিংসা, আর হানাহানি। মানুষ মানুষে নিষ্ঠুরতা আর ব্যাপক ধ্বংসলীলা তখনই আমাদের সকলকে মনে করতে হবে বুদ্ধের অহিংসনীতি ও মহান বাণী। যা আমাদেরকে সঠিক দিশায় ফিরিয়ে আনতে পারবে।

এখন আমরা যেই কাহিনী কিছুটা আলোচনা করবে - আমরা সকলে জানি বুদ্ধদেব তাঁর নাম 'বুদ্ধদেব' তপস্যালাভের পর হয়, তিনি ছিলেন কপিলাবস্তু রাজা শুদ্ধধোনের ও রানী মায়দেবীর পুত্র। তখন তার নাম ছিল 'সিদ্ধার্থ'। পরে মায়দেবীর মৃত্যু হলে, বালক সিদ্ধার্থকে মানুষ করে তাঁর মাসি গৌতমী। সেই জন্য তার নাম হয় গৌতম। এখন আমরা জানবো রাজপুত্র গৌতম কি ভাবে 'ভগবান বুদ্ধ' হলেন। একটি তীরবিদ্ধ পঙ্খী শাবক আহত হলে, তাকে সেবা করে কিভাবে গৌতম তার বেদনা উপশম করলেন। একদিন নগর পরিভ্রমণ এ বেরিয়ে যে তিনটি দৃশ্য তাকে রাজপুত্র থেকে সন্ন্যাসী বুদ্ধে উপনীত করালেন। গৃহে ফিরে তিনি সুন্দরী স্ত্রী ও শিশু পুত্রকে ছেড়ে গৃহত্যাগ করলেন। এবং তপস্যায় সিদ্ধিলাভ ও করলেন। তাঁর মহান বাণী এবং অহিংস নীতি প্রচার করলেন। আর্ত, দরিদ্র, পতিত, মানুষের সেবায় নিজেকে নিয়জিত করলেন। তাঁর যারা শিষ্য ছিলেন সকলে তাঁকে 'ভগবান বুদ্ধ' বলে অভিহিত করলেন। যে গাছের তলায় তিনি সিদ্ধিলাভ করেছিলেন সেই গাছের নাম হল 'বোধিবৃক্ষ' এবার তাঁর শিষ্যেরা সারিপুত্র, অনার্থপিন্দদ প্রমুখ তাঁর বাণী প্রচার করতে দেশে বিদেশে চলে এলেন। আজ ও সেই বাণী মানুষকে শান্তি ও মৈত্রীর পথ দেখাতে পারে।

৮০ বছর বয়সে 'ভগবান বুদ্ধ' কুশীনগর দেহত্যাগ করেন। আজও আমরা স্মরণ করবো তাঁর সেই মহান বাণী -

'বুদ্ধং শরণ ! গচ্ছামী,
সঙ্ঘং শরণ ! গচ্ছামী'

ওরা অতিথি

পূজা নাথ
ইতিহাস বিভাগ

সেদিন রবিবারের সকাল, আমি ট্রেনে করে ফিরছিলাম মা'ও ছিলেন সাথে। আমাদের তিলোত্তমা কলকাতা থেকে পুজোর আগে কেনাকাটা করতে গিয়েছিলাম। কিছুটা কেনাকাটি আর কিছুটা ভাউচার গিফট্-এ আমাদের চারহাত প্রায় ভর্তি বলা চলে। কিন্তু আজ ট্রেনের জানালার ধারে সিটটায় বসতে না পারার জন্য মনটা ভেঙে পরেছে এক্কেবারে। এমন সময় আমাদের কামরায় বসে থাকা অনেকের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গেল। কেউ বলছে 'ওরা তো বস্তির ছেলে পুলিশ এখন সামনে আসবে আর জোর জার করে টাকা আদায় করে তবেই যাবে। কেউ বা বলছে, 'খিদের জ্বালা, ওরা কি আর করবে?'- আরও কত কি।

সবার কথা শুনে তাকিয়ে দেখি তিনজনকে নজরে পড়ল, বাড়িতে ফিরে যাদের নাম দিয়েছিলাম ক্ষণিকের অতিথি। ওরা ট্রেনের আর দশটা-পাঁচটা সহযাত্রীদের মতো নয়, তারা সাহায্য প্রার্থী হিসেবে হাত দুটো বাড়িয়ে দিচ্ছে আমাদের দিকে। বলা যেতে পারে কিন্তু সেটা ভিক্ষার জন্য নয়। কেউ সাহায্য দিতে সমর্থ আর কেউবা দিতে সমর্থ হলেও দিচ্ছে না। ওরা সংখ্যায় তিন, একজন মাঝ বয়সী নয় বা দশ বছর, আরেকটি বাচ্চা ছেলে তার বয়স হয়তো ৪ অথবা ৫ এর কাছাকাছি হবে। যতদূর মনে হয়, ওরা হিন্দমোটর থেকে উঠেছিল। বাচ্চা মেয়েটির মা মেয়েটিকে এগিয়ে এলো আর মেয়েটিও প্রতিটি জায়গায় গিয়ে গিয়ে একটা বিশেষ রিং-এর উপর তার খেলা দেখাতে শুরু করলো। শরীরটাকে বেঁকিয়ে খুব কৌশলে রিংটির মধ্যে সম্পূর্ণ গলিয়ে দিয়ে আবার আগের অবস্থায় দাঁড়িয়ে পড়ছিল বারবার। আবার কখনো সে রিংটির মধ্যে সে তার মাথা এবং পা দু'টিকে সুন্দর নির্ভয়ে গলিয়ে দিয়ে হাসি হাসি মুখ নিয়ে মেরুদণ্ডটিকে বেঁকিয়ে নানা কৌশল করে আমাদের তাক লাগিয়ে দিচ্ছে। তারপর সে নানান জিমনাস্টিক করছিল যেন মনে হচ্ছিল মেয়েটি অনেকবার সার্কাস দেখে এই ধরনের রিং প্রদর্শনী শিখেছিলো। ওদের দেখে মনে হয় 'নুন আনতে পান্তা' ফুরোনোর মত অবস্থা। তাই আমার ভাবনাটা ভাবনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এটা ভেবে যে, ওদের দেখে মনে হচ্ছিল টিকিট কেটে বারংবার ওদের পক্ষে সার্কাস দেখা সম্ভব ছিল না। হয়তো শিখেছিল কিন্তু অন্য কোনো উপায়ে সে যাই হোক।

পুজোর কিছুটা আগে পুজোর কেনাকাটা করে নিলেও সেই সময় আমি অর্থের মালিক ছিলাম না। তাই মায়ের হাত থেকে বিল পাশ করেই আমার হাত দিয়ে দশ টাকা দিয়েছিলাম সেই মেয়েটিকে, যখন তার সব কটি কৌশল শেষ হয়ে গিয়ে ছিল।

হ্যাঁ, একজন বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানের কাছে দশ টাকা মানে অনেকটাই। আর সেটাই যখন গরীব মেয়েটির হাতের নাগাল হল। মেয়েটিতো বেশ খুশি। যেন মনে পড়ে গেল কবির সেই লাইনগুলি -

‘‘ আমরা তো অল্পে খুশি,
কী হবে দুঃখ করে?
আমাদের দিন চলে যায়
সাধারণ ভাত কাপড়ে।’’

জানি, এই জি.এস.টি-এর যুগে দশ টাকা তো কিছুই নয়। আমার কাছে সবথেকে ভালোলাগার বিষয়, সেই মেয়েটি আমাকে যখন বলেছিল টাকা টা হাতে পাওয়ার পর, ‘থ্যাঙ্ক ইউ দিদি।’ এক সেকেণ্ডের মধ্যে একটা ভালোলাগা কাজ করে গেল। ওর ছলছল দুটো চোখ যেন আমাকে আরও কিছু বলার জন্য আকুপাকু করছিল। কিন্তু সেই মুহূর্তে ওর মা ওকে ডাক দিয়ে বললো, ‘এগিয়ে চল্ পরের টাতে।’ ওই সেই একটু সময়ে আমার আর মেয়েটির মধ্যে যেন কিছুটা মায়ার, ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। আমার মনে হয়েছিল আশ্বাস দিয়ে যেন বলছিলাম - ‘আমি থাকবো তোর পাশে।’ সেই মেয়েটির চোখে মুখে লেখাপড়া শেখার আগ্রহ প্রকট তা দেখে বুঝতে পেরেছিলাম। কিন্তু তেমন কিছু বলে উঠতে পারিনি যে, ‘তবে শিখিবি আমার কাছে?’ মনে মনে বললাম, ‘নিজে যদি পড়তে পারি, তবে তোদের কেও শেখাবোনা কেন? নিশ্চয় শেখাবো।’ তারপর কিছুক্ষণের জন্য আমি কি যেন সব ভাবছিলাম, ‘আত্মীয় বন্ধু সমাজ’ - এইসব কিছুর উর্দ্ধে একটি নিজস্ব পরিচিত খুবই প্রয়োজন। নিজের ভালো থাকার শ্রেষ্ঠ উপায় কোনো জড় বস্তুকে অবলম্বন করে নয়। জীবন্ত ফুটফুটে প্রাণোজ্জ্বল কতগুলো ছোট শিশু, দুঃস্থ মানুষ জনদের যতটা সামর্থ্যের মধ্যে হয় সু-শিক্ষা লেখাপড়া শেখানোর মাধ্যমে তাদের মধ্যেও জ্ঞান-চক্ষুর বিকাশ ঘটানোর মধ্যে দিয়ে, যদি কিছুটা আলো ছড়িয়ে দিতে পারি তাহলে নিজস্ব সুখ অন্বেষণ বোধ হয় সার্থক হতে পারে।

ঠিক সেইসময় মায়ের দেওয়া বেশ জোর একটা ঝাঁকুনিতে এইসব চিন্তায় ছেদ পড়লো ঠিকই তবে, সেদিন থেকেই বেঁচে থাকা আর পাশাপাশি কিছু করার জন্য একটা আগ্রহ অনুভব করতে থাকলাম, জীবন যেন একটা নতুন মাত্রা পেল।

একজন শিক্ষার্থীর মনে মহামারির প্রভাব

সোমাশ্রী সরকার
নিউট্রিশন অনার্স

মাধ্যমিক পাশ করার পর আমার মা-বাবা, শিক্ষক, শিক্ষিকা সকলের মুখে শুনে এসেছি আর দুটো বছর অর্থাৎ একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণি মন দিয়ে পড়াশুনা করে উচ্চমাধ্যমিকে ভালো ফলাফল করলে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। আরো বাকি সকল শিক্ষার্থীর মতো আমিও এই সংকল্পে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়ে এগাতে শুরু করলাম। বিদ্যালয়ের সবচেয়ে উজ্জ্বল দুটো বছর পেরিয়ে এসে পৌঁছলাম সেই সময় যা পার করলেই উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ। সবকিছু ঠিকঠাক চলছিল। দ্বাদশের টেস্ট পরীক্ষার পর হঠাৎ একদিন সংবাদমাধ্যমে দেখলাম বিদেশে এক জীবনহানি ভাইরাস-র খোঁজ পাওয়া গেছে মানবশরীরে। আমাদের মতো মধ্যবিত্তের মতে ভারতের মতো ১৪০ কোটি মানুষের দেশে সেখানে ইংরেজরাও পরাস্ত সেখানে এক 'সামান্য' ভাইরাসের প্রবেশ অসম্ভব।

এরপর সম্ভবত ফেব্রুয়ারি মাসের শুরুর দিকে, তখন উচ্চমাধ্যমিকের প্রস্তুতি একদম শেষ পর্যায়ে, এমনই এক সকালে ভারতে প্রথম সেই 'সামান্য' করোনা ভাইরাসের আগমন অর্থাৎ আক্রান্তের খোঁজ মিলল। এক 'সামান্য' ভাইরাস সে কতটা 'অসামান্য' হতে পারে তার পরিচয় ক্রমশ পেতে লাগল সকল দেশবাসী। আমাদের উচ্চমাধ্যমিক শুরুর দিন অর্থাৎ ১২ই মার্চ, ২০২০ সকালবেলা এক অদ্ভুত অনুভূতি। জীবনের দ্বিতীয় বড়ো পরীক্ষা বলে কথা, যার ওপর আমার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ, মা-বাবার আশা, আরও কত কি! পরীক্ষা ক্রমে চতুর্থদিনে এসে পড়ল, আর মাত্র দুটো বিষয়ের পরীক্ষা বাকি তখনও। পরীক্ষা দিয়ে বের হয়েই সকলের মুখে শুনছিলাম পরীক্ষা নাকি অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত করে দেওয়া হবে। তখন পশ্চিমবঙ্গের পরিসংখ্যান বলছে ৫ জন আক্রান্ত। প্রথমে ভেবেছিলাম এখনও সম্ভব নয়, উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা স্থগিত করা হবে, অসম্ভব। কিন্তু কোথাও একটা চোখের সামনে দেখা স্বপ্নগুলো আস্তে আস্তে অন্ধকারে ডুবতে লাগল। পঞ্চম দিনের পরীক্ষার একদিন আগে দুপুরবেলা ফোনে এক বন্ধুর পাঠানো ম্যাসেজ দেখে টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখতেই দুদিন আগের সেই ভয়টা সত্যি হল, আর তার একদিন পর থেকে সারা ভারতজুড়ে 'লকডাউন'।

তবে কোথাও একটা আশা ছিল যে সব ঠিক হয়ে যাবে, সব আগের মতো হবে। তারপর ধীরে ধীরে মাসের পর মাস পেরোয় কিন্তু এক অদ্ভুত ভয় মনের ভিতর আঁকড়ে ধরতে শুরু করে। তাহলে কি সত্যিই আর পরীক্ষা দিতে পারবো না! টেলিভিশনের পর্দায় চোখ রাখলেই শুধুমাত্র আক্রান্ত ও মৃতের সংখ্যার গননা। তারপর এক বিকেলবেলায় বুঝলাম যে সব স্বপ্ন শেষ, 'উচ্চমাধ্যমিক

বাতিল'। শুধুই একটা কথা মনে হচ্ছিল তাহলে এই প্রস্তুতি, আশা এইসবের কোনো মূল্যই রইল না। পরিষ্কার বুঝতে পারছিলাম সামনের ভবিষ্যৎ রাস্তাটা কতটা কঠিন হতে চলেছে।

এরপর রেজাল্ট বেরোল, সবার মুখে একটাই কথা 'আরে, তোদের তো পরীক্ষাই হয়নি!!' তারপর কলেজে ভর্তি হওয়ার দৌড় শুরু। কিন্তু অদ্ভুতভাবে সেই দুবছর আগে দেখা স্বপ্নটার কোনো পরিনতি মনে হচ্ছিল না, মনে ছিল শুধু ভয় এবং এক অদ্ভুত আশঙ্কা, শুধুমাত্র ভবিষ্যৎ-র কথা ভেবে। আস্তে আস্তে বন্ধু, আপনজন সকলের পরিসীমানা ছোটো হতে শুরু করল। তারপর শুরু অনলাইন ক্লাস আর শিক্ষার এক নতুন পর্যায়। হয়তো পরিস্থিতি আগের থেকে কিছুটা সচল হলেও, মনটা আর সচল হয়নি।

কলেজ জীবনের একটা বছর অতিক্রম করতে লাগলাম। কিন্তু ওই জীবনে আর প্রবেশ করতে পারিনি। যে ভবিষ্যৎ-র আশা নিয়ে দু-বছর আগে পথ চলা শুরু করেছিলাম তা এখন অন্ধকারে বিলীন, শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা ছাড়া আর কিছু করার নেই। কলেজেরে শিক্ষিকারা সবসময় চেষ্টা করছেন যাতে আমরা কোনোভাবে পিছিয়ে না পড়ি, কিন্তু যে পরিস্থিতিতে পুরো শিক্ষাব্যবস্থা অচল হয়ে গেল সেখানে, তাদের, সামাজের এবং সকল শিক্ষার্থীর কিছু করার নেই। হয়তো দেখতে গেলে মনে হতেই পারে এই তীব্র মহামারির সংকটকালে মানুষ প্রতিনিয়ত যে দুঃসহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হচ্ছে তার কাছে এই অসুবিধা কিছুই নয়, কিন্তু যাদের সামনে পুরো ভবিষ্যৎটাই অনিশ্চিত তারা হয়তো মহামারি আক্রান্ত নয়, মানসিকভাবে বিপর্যস্ত, বিধস্ত। তবে সময়ের তাগিদে সবকিছুকে মেনে নিয়ে শুধু মনের বিতর ভবিষ্যৎ-র আশা নিয়ে বলব -

"Life is a challenge - Meet it,
Life is a spirit - Realise it and
Life is a struggle - light it."

শিক্ষামূলক ভ্রমণ ঃ ভারতীয় সংগ্রহশালা

লাবণী মণ্ডল
বাংলা বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার

কলেজে বেশ অনেকদিন ধরেই আমাদের বাংলা বিভাগের স্যার ম্যামরা আলোচনা করছিলেন কাছাকাছি কোনো জায়গায় একটু ঘুরে আসা যাক সেই নিয়ে। এই ঘুরে আসার পরিকল্পনা হচ্ছিল এইজন্য যে, পরীক্ষার এত সিলেবাস এত চাপে সবারই বেশ একটা কেমন হাঁপিয়ে ওঠা একঘেয়েমি ভাব চলে এসেছিল। তাই যাতে মনটা একটু বেশ হাল্কা ফুরফুরে হয় আর তার সাথে একটা শিক্ষামূলক ভ্রমণও হয়ে যাবে। এই ভেবে কথাটা ভাবা হচ্ছিল। এতে আমাদের নানা জিনিস দেখা ও শেখাও হয়ে যাবে। কাছাকাছি কোথাও এই জন্যেই যে আমরা সবাই এতগুলো মেয়ে যাব তাই রাতে কোথাও থাকাটা একটা রিস্কের ব্যাপার। তার ওপর তো কিছুজনের বাড়ির বাবা মা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনের আকাশ ভাঙা কাজের মতো কড়া হুকুম 'বাইরে রাত কাটানো চলবে না'। অগত্যা আমাদের ভাবনায় পড়তে হল কাছাকাছি কোন জায়গায় যাওয়া যেতে পারে। অবশেষে সবার মত অনুসারে ঠিক হল যে 'সংগ্রহালয়' দেখতে যাওয়া হবে। সেই মতো একটা দিনও বাছাই করা হল। ৬ই ডিসেম্বর, ২০১৯ তারিখ ঠিক করা হল সবাই মিলে যাওয়া হবে। তবে শুধু আমাদের বাংলা বিভাগ নয়, জুওলজি বিভাগ ও নিউট্রিশান বিভাগ-এর কিছু মেয়ে ও স্যারও যাবেন এই কথা হল। সকাল ৮ঃ২৮ এর ব্যান্ডেল হাওড়া লোকাল ধরার কথা ছিল আমাদের সবার, সেইমতো সকাল ৮টার মধ্যে আমাদের সকলকে ব্যান্ডেলে উপস্থিত থাকতে বলা হয়। যথারীতি সেই দিন এসে উপস্থিত হল আর এর মধ্যে মজার ব্যাপার হল সেইদিনই আমার চোখে ঘুম বাবাজি এসে ভর করলেন আর আমার উঠতে দেরী হল। যাইহোক কোনোরকমে অর্ধেক তৈরী হয়ে বেরোলাম। সাজার সমস্ত জিনিস ব্যাগে নিলাম কিন্তু টিফিন সে যে যার মতো স্বস্থানেই পড়ে রইলো আমার ব্যাগে আর তাদের জায়গা হল না। কোনোরকমে ট্রেনে উঠে বাকি সাজগোজ সেরে নিলাম। বলা বাহুল্য আমরাই (আমি আর দীপান্বিতা) কিন্তু ব্যান্ডেলে সবার আগেই পৌঁছালাম। একে একে সবাই এল টিকিট কাটা হল সবার। ট্রেন আসতেই শুরু হল হুল্লোড় কে আগে ট্রেনে উঠে কার কার পাশে বসা হবে। আমরা সবাই ট্রেনে উঠে নিদেরে পছন্দমত জায়গায় বন্ধুদের সাথে বসে পড়লাম। বেশ হইহুল্লোড়, মজা করে ট্রেনে আসছিলাম আমাদের সঙ্গে ম্যামেরাও ছিলেন মহিলা কামরায় আমাদের সাথে এভাবে বেশ উৎসাহের সাথে আমরা সবাই হাওড়া পৌঁছালাম। কিন্তু সবথেকে বেশি মজার জিনিস হয়েছিল তা হল বাসে ওঠো নিয়ে। আমরা প্রায় ৩০ জন মত ছিলাম। একটা বাস পুরো তো আমাদেরই লেগে যাবে। যথারীতি সেই ভেবেই লাইন দিলাম সবাই মিলে পরপর। কিন্তু বাস যাও বা পাওয়া গেল তাতে হয়ত গোটা দশজন মত ধরবে। কিন্তু অর্ধেক অর্ধেক আমারা যাব না তাই সামনে

আমরা ৩০জন থাকা সত্বেও পিছনের লোকজনদের ডাকতে লাগলাম। প্রথমটা অবশ্যই অবাক হয়েছিলেন তাঁরা, যে আমরা কোন্ গ্রহের প্রানী যে সামনে বাস আর প্রথমে লাইন থাকা সত্বেও কেন আমরা উঠছিনা। পরে হয়ত জেনেছিলেন যে আমরা একই কলেজের মানুষজন। আর তাই সবাই একসঙ্গে যাওয়ার জন্যই এই কীর্তি করছি। মনে মনে নিশ্চয়ই ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন তারা আর ধন্যবাদ দিচ্ছিলেন তাকে যার মুখ তারা ঘুম থেকে উঠেই দেখেছিলেন। কারণ অফিস টাইমে এমন সামনের তিরিশ জনের পরে লাইন থেকেও তাদের আগে বাসে চড়া এটা সত্যিই বোধহয় অকল্পনীয় ব্যাপার। যাইহোক আমরা তখন অপেক্ষায় একটা গোটা বাসের পেটে ঢোকা আর তাকে দখল করে নেওয়া কিছুক্ষণের জন্য যতক্ষণ না গন্তব্যে পৌঁছাচ্ছি। অবশেষে দেখা মিলল সেই বহু প্রতীক্ষার বাসটির। আমরা সবাই রীতিমত ব্যস্ত হয়ে পড়েছি জায়গা পাওয়ার জন্য। বাসে বসেই পেট বাবাজি জানান দিলো এবার বোধহয় তিনি কাজে ইস্তফা দেবেন যদি না তাকে মাইনে দেওয়া হয় অর্থাৎ সে বলতে চাইছে তাকে খাবার দেওয়া হোক। যে যার মত হাল্কা টিফিন নিয়ে গিয়েছিল তা ভাগাভাগি করে খেতে থাকলাম। শুধু আমি ছিলাম সেখানে খাদ্য প্রতিযোগীতার সেই পরীক্ষক যার কিনা শুধু সবার খাবার থেকে খাবার টেস্ট করা ছিল কাজ। এভাবে নানা গল্প, হাসি, মজা, আড্ডার মধ্যে দিয়ে আমরা পার্ক স্ট্রীটে নেমে একটু দূর হেঁটেই পৌঁছালাম আমাদের গন্তব্য 'সংগ্রহালয়'-এ। ওপরেই দেখি লেখা 'ভারতীয় সংগ্রহালয় ১৮১৪'। টিকিট কাটা হল সবার জন্য। নির্দেশ জারি হল সবার ব্যাগপত্র যা আছে সব জমা করতে হবে টিফিন নিয়ে ঢোকা নিষিদ্ধ তাই সেই কথা মতো ব্যাগগুলো বন্দী করে রেখে ঢুকলাম সবাই ভেতরে। কিন্তু আমরা সব বান্ধবীরা হলাম ডিজিটাল ইন্ডিয়ার উন্নত গোছের মানুষজন। তাই স্যার ম্যামদের শত বারণ সত্বেও সেলফি তোলার কাজটা চালিয়ে গেলাম ভালো মতই। অবশেষে সবার একটা গ্রুপ ফটো তুলে সেই ছবি তোলার কাজে ক্ষান্ত দিলাম। ভেতরে গিয়ে আগেই আমরা খুঁজতে থাকলাম খাবার জায়গা, যতই হোক ভোজনরসিক বাঙালী কিনা। খুঁজেও পেলাম অল্পক্ষণের মধ্যেই, সেখানকার ক্যান্টিন। আমরা কয়েক জন আমিষ ও বাকি কিছু বান্ধবী ও ম্যাম নিরামিষ খাবার খেলেন। তারপর শুরু হল আমাদের সবটা ঘুরে দেখা। ভেতরে গিয়ে নানা জীবজন্তুর হাড় যেমন - রাইনোসোরাস, ডলফিন, তিমি, বাঘ, ভালুক, সিংহ, পাখি, সাপ, নানা পোকামাকড় পতঙ্গ, হাতির দাঁতের জিনিস, তুলো, রেশম, পাট, মুদ্রা আরও নানা জিনিস-এর সংগ্রহ দেখলাম। দেখতে দেখতে ভারী আশ্চর্য লাগছিল এত সব সংগ্রহ দেখে। আমাদের দেশের এছাড়া অন্যান্য নানা জায়গার নানা অজানা জিনিস জানতে পারছিলাম। সেইসব অতীব সূক্ষ সুন্দর কারুকার্য করা জিনিস তো মন্ত্রমুগ্ধের মত দেখতেই থাকলাম আমরা। এ প্রসেঙ্গ বলে রাখি আমরা তিন চারটি দলে ভাগ হয়ে গিয়ে দেখছিলাম জিনিসগুলো। আমরা যে দলে ছিলাম তাতে আমি, আমার তিন সহপাঠী (দীপান্বিতা, লাবণী, দিশা) ও আমাদের একজন স্যার (বিশ্বজিৎ কর্মকার) ছিলেন। তিনি আমাদের খুব ভালোভাবে গাইড করছিলেন। আর একজন স্যার ছিলেন

আমাদের সঙ্গে (নির্মাল্য সেন শর্মা) তিনি যদিও খুব অল্প সময়ই ছিলেন। অন্যদিকে আমাদের বিভাগের আর দুই ম্যাম (নন্দিনী মুখোপাধ্যায় ও স্বপ্না দাস) তারাও ছিলেন অন্য দলগুলির সঙ্গে। এখানেও বেশ একটা ভালো ব্যাপার হয়েছে একজন বিদেশী মানুষের সাথে দেখা হল আমাদের গ্রুপের সাথে। উনি আয়ারল্যান্ডের মানুষ ছিলেন। খুব ভালো কথা বলছিলেন স্যারের (BK) সঙ্গে। যদিও উনি ইংরেজীতেই বলছিলেন তবুও তার টান এমন যে উনি দু-তিনটে কথা বলার পর আমি ওনার বলা প্রথম কথাটা বুঝতে পারছিলাম তাও আবার খানিকটা। যাইহোক স্যারের জোরাজুরিতে অবশেষে আমি তার নাম জিজ্ঞেস করতে সমর্থ হয়েছিলাম। নামটা বেশ ভালো ছিল ওনার 'লিউকো'। উনি নাকি বেশ কিছু লেখালেখি করেন। উনি নিজে যেচেই আমাদের সাথে ছবি তুলতে চাইলেন। আমিও আমার মোবাইলে একটা ছবি স্মৃতি করে এনেছিলাম স্যারের সহযোগিতায়। সত্যিই বেশ ভালো লাগছিল ওনার সুমিষ্ট ব্যবহারটা। এপ্রসঙ্গে বলে রাখি আমাদের বান্ধবী লাবণী দাস তো বেজায় খুশি ছিল বিদেশী মানুষের সাথে ছবি তুলতে পেরে। প্রথম থেকেই এই ইচ্ছে ছিল তা, শেষমেষ পূরণ হল। দুপুরের সময়টা এভাবেই কেটে গেল বেশ আনন্দের সাথে। ধীরে ধীরে সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে বিকেল নামতে শুরু হল আর আমাদেরও সেই সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে শুরু হল আর আমাদেরও সেই সঙ্গে প্রস্তুতি নিতে শুরু করতে হল বাড়ি ফিরে আসার। ব্যাগগুলো মুক্তি পেলো ও অবশেষে তাদের বন্দী দশা থেকে। সারাদিন বন্ধুদের সাথে হাসি, আড্ডা, মজার একসাথে থাকার পর আর ইচ্ছে করছিল না যে বাড়ি চলে আসি তবুও তো ফিরতে হবেই। সকালের নীড়ছাড়া পাখিরা সারাদিন কলরব করে এদিক ওদিক ঘুরে বেড়ালেও বিকেলের পর সন্ধ্যে নামার মুখে সেই ছোট্ট নীড়েই ফিরে আসে, আসতে হয়। তাই তেমনই শত অনিচ্ছাতেও ছকে বাধা নিয়ম মেনেই একরাশ মন খারাপ আর ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বাড়ির পথ ধরলাম আমরা। তবে যাওয়ার মতো ফেরাটা আর একসাথে হল না, আমরা কিছু জন আর ম্যাম শিয়ালদহ বাস ধরলাম আর বাকি স্যার ম্যাম ও অন্যান্য বন্ধুরা হাওড়ার বাসে উঠে পড়ল। তারপ ট্রেন ধরে যে যার বাড়ির উদ্দেশ্যে রওনা দিলাম। সারাদিনের ক্লান্তি তার সাথে হাসি মজার স্মৃতিগুলো বহন করে নিয়ে বিষাদ মনেই যে যার বাড়িতে ভালোভাবে ফিরে এলাম আমাদের এই ছোট অথচ একদিনের এই সুন্দর ভ্রমণটা স্মৃতির মণিকোঠায় উজ্জ্বল হয়েই থেকে যাবে। কিছু স্মৃতি কোনোদিন ভোলার নয় এটাও ঠিক তেমন ভাবেই আমাদের মনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

অবুঝ শিশুর অবুঝ কথা

রাখী বর্মন
ইতিহাস বিভাগ, প্রথম সেমিস্টার

সন্ধ্যাবেলা ৭টা বেজেছে মানেই আমাদের ঘরের ছোটো পাঁচ বছরের ভাই তমালকে তার মাস্টারমশাই পড়াতে আসবেন। আর পড়াতে এলে রুটিন মেনে পড়া দেওয়ার মতোই যেন তার পড়া না পাড়ায় মার খাওয়াটাও একটা প্রতিদিনের নিয়ম হয়ে দাঁড়িয়েছে।

এই শিশুমনে ছোটোবেলা থেকেই পড়াশোনাকে এমনভাবে তাদের সামনে উপস্থাপন করা হয়। সেটি ধীরে ধীরে একটি ভীতিতে পরিনত হয় বলে অন্তত আমার মনে হয়। তাদের শিশুমনে যা বোঝানো হবে যেমন ভাবে ভাবানো হবে। তেমনভাবেই তো তাদের বোঝার ও ভাবার ক্ষমতা তৈরী হবে। এই সহজ জিনিসটা যেন কোনো কোনো বয়স্ক মানুষও অনুধাবন করতে পারেন না। এই শিশু সময়ে যদি তাদের মনে উপর মানসিক চাপ সৃষ্টি না করে, তাদের বোঝানো হয় যে 'তুমি যতটুকু পড়বে, ঠিক ততটুকুই তুমি জানতে পারবে!!' কিন্তু তার বদলে বাড়ির বড়োরা ওকে যেন ওর পড়াটাকে ওর কাছে বাধ্যতামূলক করে তোলেন। ছোটোবেলার এই দিনগুলোই যদি কোনো শিশু এত মানসিক চাপে বড়ো হয়, সেখানে বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তৈরী হতে থাকা মানসিক কষ্টের কথা ছেড়েই দিলাম।

আর এখনকার এই করোনা মহামারির সময় এই শিশুজীবনগুলি এক দীর্ঘ আনন্দের হাত থেকে বঞ্চিত। তারা না পারে পার্কে যেতে, না পারে স্কুলে যেতে যে সময়টা তাদের জীবনের সবচেয়ে আনন্দ করে কাটানোর কথা অর্থাৎ স্কুল জীবনটা তো তারা হেলাতেই হারালো। আর তার মধ্যে বাড়িতে সামান্য পড়াতে আসা মাস্টার মশাইয়ের কাছে মার খাওয়ার পর্বটাও এতটাই বিস্তৃত। যে তাদের কাছে পড়াটা আর ভালোবাসার বিষয় থাকে না, সেটা ধীরে ধীরে আতঙ্কে রূপান্তরিত হতে থাকে।

আর এখনকার ছোটোদের বকা খাওয়ার এক অন্যতম প্রধান উপকরণ হল মোবাইল ফোন। তারা সারাদিন এই মোবাইল ফোনে মুখ গুঁজে বসে থাকাকে বেশি সুখের বলে মনে করে স্কুল জীবনের থেকে। অথচ যেসব মায়েরা এই দণ্ডে নিজের ছেলেমেয়েকে দণ্ডিত করেন, তারা একবারও ভেবে দেখেন না যে তার-পাঁচ বছরের শিশুটি যা দেখছে তাই শিখছে। এটা বোঝার কোনো চেষ্টাই অভিভাবকগণ করেন না, তার চোখের সামনে ঘটে চলা জিনিস থেকেই যে শেখে এটা বোঝার ক্ষমতা যেন তাদের নেই। অথচ যখন বাচ্চাটি খেতে চায়না, তখন তাকে খাওয়ানো মোক্ষম ওষুধ যেন ওই মোবাইল ফোনটা। আমার ছোটো বাচ্চাটিকে একা বাড়িতে রেখে যখন বাবা-মা কোনো জরুরি কাজে বাইরে বের হল তখন যেন মোবাইলটাই মা বাবাকে বাঁচিয়ে দেয়।

আবার বাচ্চা যখন টি.ভি. দেখেছে তখন মা-বাবা দুজনেই মুখটি ডুবিয়ে রাখেন ফোনের জগতে তাহলে এটা তো খুব সাধারণ ব্যাপার যে মা-বাবা যখন টি.ভি. দেখবেন তখন শিশু তার মুখ মোবাইলেই আটকে রাখবে।

এখন আর তেমন কোনো বই পড়া স্বভাবের মানুষ অর্থাৎ বই পড়তে ভালোবাসেন, অবসর সময়ে বই পড়েন এমন মানুষ হাতে গোনা কিছুজনই হয়তো আছেন। তাহলে শিশুরা কোনো মোবাইল ফোন ছাড়া বাঁচতে পারবে এই সাধারণ ব্যাপারটা যে কোনো কোনো বয়জ্যেষ্ঠ্য মানুষেরা অনুধাবন করতে পারেন না, তা তো বাবা আমি বুঝতে পারি না।

যেদিন প্রত্যেক বাবা মা অনুধাবন করতে পারবেন যে, সন্তানের আচরণ কেবল তার মা-বাবার আচরণেই প্রতিফলনমাত্র। সকল মা-বাবা যখন বুঝবেন বা যদি মা-বাবারা বুঝতে পারেন তাহলে কখনোই ছোটো শিশুদের ,বিচারের কাঠগোড়ায় না তুলে সর্বপ্রথম নিজেদের মধ্যে সেই ভুল আচরণটি খুঁজে বার করার চেষ্টা করতেন, যেটি তার সন্তানের চিন্তাধারা বা ব্যবহারে প্রভাব ফেলেছে।

বর্তমান ছোটোবেলা থেকেই শিশুদের উপর চিৎকার চেঁচামেচি করে তাদের মন মানসিকতাটাই এমনভাবে তৈরী হচ্ছে, যে কখনো কখনো শিশু মনের দুঃখ থেকে শিশুটি ভাবে যে, তার বাবা মা বুঝি তাকে খাইয়ে দেয়, স্নান করিয়ে দেয়, তাই তার উপর যা ইচ্ছা করা যায়। শিশুটির নিজস্ব ইচ্ছা যেন মৃত্যুসম হয়ে দাঁড়িয়েছে, কারন সে এখন পরনির্ভর। তার বাবার কঠোর পরিশ্রমের উপার্জনে এবং মায়ের কঠোর পরিশ্রমের দ্বারা সে বড়ো হচ্ছে বলে বুঝি তার উপর এতো অত্যাচার। ছোটোবেলা থেকেই এসব দেখে মানুষ হওয়া শিশুমনে যন্ত্রণাগুলো মনেই থেকে যায়। আর বাড়িতে বড়োদের করা নানা অন্যায় কাজের প্রতিবাদ তাদের করতে ইচ্ছা করলেও তাদের হাত পা বাধা থাকে কড়া শাসনে। এই যেমন বাড়ির বড়োদের যখন দেখে যে তার বৃদ্ধ ঠাকুমাকে বা দাদুকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠানোর ঘটনা, বাচ্চাটি কিছু করতে চাইলেও করতে পারে না। বর্তমানে সন্তানের মধ্যে ভালোবাসা, দায়িত্ব কর্তব্য ধীরে ধীরে এমন একটা অঙ্কের সহজ হিসাবে বাঁধা হয়ে গেছে বলেই মনে হয় কিছু কিছু পিতা মাতার জীবনের শেষ আশ্রয় হয়ে দাঁড়ায় বৃদ্ধাশ্রম।।

ছোটো শিশুদের সাথে মা-বাবা বা বড়োদের ব্যবহারটা ঠিক এটা ভেবেই করা উচিত, যে একটা সময় আমাদের তথা বড়োদের করা ব্যবহারই শিশুর ব্যবহারের মাধ্যমে আলোর প্রতিফলনের ন্যায় প্রতিফলিত হবে। কারণ একটি শিশু শূন্য হয়ে জন্মায়, তবে সে পূর্ণ হয় পারিপার্শ্বিক ব্যবহার ও আচার আচারণের মাধ্যমে। তাই মা বাবা কেই খেয়াল রাখা উচিত। একটি শিশুর পূর্ণতা কীসের দ্বারা হচ্ছে? ভালো আচরণ নাকি খারাপ ব্যবহার!

কৃত্রিমতার ব্যাধি

প্রিয়াঙ্কা দাস
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ

'ব্যাধি' এই দুই অক্ষরের শব্দটি শ্রুতিগোচর হওয়া মাত্রই এক হাড় হিম করা ভয়ের শীতলা বাতাস আমাদের সারা শরীরটাকে যেন শিহরিত করে যায়। কোথা থেকে যেন এক অকাল কাণ্ডজ্ঞানহীন আতঙ্ক হঠাৎ চোরের মতো উদ্ভব হয়ে আমাদের মনের অভ্যন্তরে বাসা বাধে। এই ব্যাধি যখন পুষ্টি লাভ করিয়া প্রসারতা লাভ করে তখন তাকে 'মহামারি' নামে ভূষিত করা হয়। এই ব্যাধি তার যাত্রাকালে এক বিরাট রাক্ষসে হাঁ দ্বারা গিলে ফেলে অসংখ্য নিরীহ প্রাণকে। কাঠে যেমন উইপোকা ধরলে তার সুঠাম দেহের আর শেষরক্ষা হয় না। তেমনি মানুষের শরীরে একবার ব্যাধি প্রবেশ করলে তা শরীর হতে আর বাহির বেরোতে চায় না কারণ।

'এ যে যেই সেই ব্যাধি নয়
এ হল কৃত্রিমতার ব্যাধি'।

যার কবলে একবার পড়লে কৃত্রিমতার সেই অদৃশ্য দেওয়াল কীভাবে ফুটো করে বাইরে আসবে তা সত্যই সকলেরই অজানা। বর্তমানে একাধিক শব্দ এক মস্ত বড় ফ্যাসান হয়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। সেগুলি হল Online Class, Online exam, Online Shopping, Online Game , ইত্যাদি ইত্যাদি। যার প্রধান ভিত্তিভূমি তৈরি করেছে 'মোবাইল ফোন' নামক কৃত্রিম যন্ত্রদানব বস্তুটি। এই যন্ত্রদানব মোবাইল ফোন ধীরে ধীরে মহামারি রূপে প্রসারিত লাভ করিয়া সকল মানুষের দেহে যেন ক্রমাগত এক ব্যাধির বীজ বুনে চলেছে। এই যন্ত্রদানবটি সকল মানুষদিগকে প্রকৃতির সান্নিধ্য থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়ে নির্বাসিত করেছে অকাশ অন্তপুরে বর্তমান যুগে ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েদের দলকে আর মাঠে প্রাঙ্গণে দেখা যায় না। শোনা যায় না তাদের হই হুল্লুর ও নতুন প্রাণ উদ্দীপনার উল্লাস। বৃষ্টিভেজা সেই দিনগুলিতে ফুটবল খেলার আনন্দ যেন তারা কোনোদিনও উপলব্ধি করেনি। আজ তাদের খুঁজে পাওয়া যায় ঘরের এক ছোট্টো কোণে এবং তাদের হাতে থাকে সেই যন্ত্রদানব মোবাইল ফোনটি। চার দেওয়ালের মধ্যে আবদ্ধ সেই ছোট্টো মোবাইল ফোনে।

তারা যেন মুক্তির স্বাদ খুঁজে পায়। আজ বর্তমান যুগে মানুষকে আর হাটে বাজারে প্রতক্ষ্য করা যায় না। শোনা যায় না হাটে বাজারের সেই উত্তেজনাময় কোলাহল। কারণ আজ মানুষ Online Shopping করে। এই মানুষগুলিই তো কৃত্রিমতার ব্যাধিতে হাত থেকে রেহাই পায়নি। ভারতমাতার সেই বীর সন্তানেরা যারা তিল তিল করে গড়ে তুলেছিল শিক্ষার ধাঁচ। আজ সেই শিক্ষার গায়ে লেগেছে কৃত্রিমতার দগ্ধ আঁচ। আর একটা কথা না বললেই নয় সেটি হল Online

Class বরফে ঢাকা পাহাড়ের ছবি দেখলেই যেমন ভূস্বর্গ কাশ্মীর দর্শন তৃপ্তি লাভ হয় না তেমন ভাবেই অনলাইন ক্লাসে শিক্ষার্থীর প্রকৃতজ্ঞান অর্জন হয় না। শিক্ষাক শিক্ষিকার সহচার্যে তাদের রত্নসম স্নানগর্ভ সত্ত্বাকে প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধি করে যে আদর্শ আমরা গ্রহণকারি তা সত্যই Online Class -এ বিলুপ্ত। আর হল Online exam যেখানে শিক্ষার্থীর যোগ্য প্রাপ্তি হয় না। আজ বর্তমানে কোনো প্রশ্নের উত্তর সন্ধানের জন্য আমরা বইয়ের পাতা উলটাইনা। বরফ ইন্টারনেট থেকে সন্ধান করি। সেই কারনে বইয়ের পাতা থেকে নতুনের গন্ধ যেতেই চায় না। এ হল এমন এক ভয়ানক ব্যধি যা আস্তে আস্তে গোটা জগৎকে ঘিরে ফেলছে। এখন প্রশ্ন হল এই ব্যাধি থেকে মুক্তির উপায় কী ?

আসলে কোনো বিষয় বা বস্তুকে আমরা কখনোই সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারি না। তার আঁচ কোথাও না কোথাও আমাদের মনের অভ্যন্তরে থেকেই যায় তাই মোবাইল ফোন, ইন্টারনেট নামক কৃত্রিমতাকে আমরা কখননোই সম্পূর্ণরূপে ত্যাগ করিতে পারব না। তাই আমাদেরকে সর্বদা সক্রিয় থাকতে হবে, কৃত্রিম বস্তুগুলি আমাদের চিত্তকে যেন কখনোই সম্পূর্ণ রূপে আহত না করিতে পারে। এই মোটের ওপর নির্ভর করে যদি সকল মানুষ এই কৃত্রিম বিষয়গুলি থেকে মুক্ত হয়ে কিছুটা সময় প্রকৃতির প্রাঙ্গণে স্বীয় স্বীয় চিত্তকে উদার করিয়া দিতে পারে। তবে আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি।

"কৃত্রিমতা আমাদেরকে নয়
বরং আমরা তাকে নিয়ন্ত্রন করিব"।

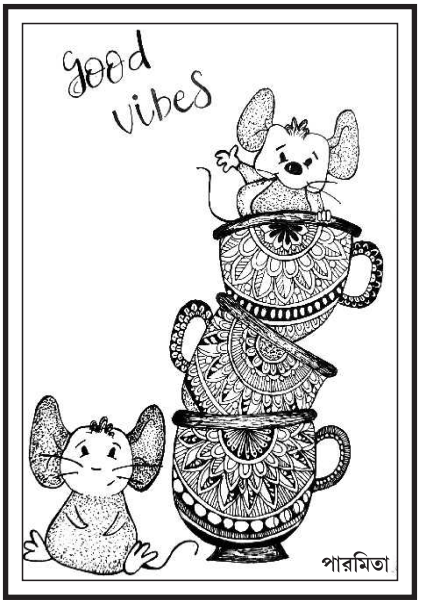

মেয়ে

ঋতিকা চক্রবর্তী
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার

জানিনা ঠাকুর কী মতে
এমন জীবন দিলে
যে জীবনে আমি যে মেয়ে
সহ্য আমার রক্তে।
ছোটো থেকে শিখিয়ে ছিল মা,
লক্ষ্মী হতে আমারে
নইলে পরে কষ্ট হবে
সকল কিছু মানতে।
কদিন পরেই বয়স যখন হল,
বছর ঐ কুড়ি
লোকে বলল এবার বিদায় কর
মেয়ে যে হচ্ছে বুড়ি।
মেয়ে যে, এ কয় বছর কাটিয়ে ছিলো
উড়নচণ্ডি রূপে,
এবার সে প্রস্তুত হবে,
ঘরের লক্ষ্মী হতে।
খুলে সকল উড়ান ডানা
জুটবে এবার বেড়ি
ঘুচিয়ে সকল মনের আসা
চলল পরের বাড়ি।
যে বাড়িতে সে জন্মনিলো
চলল গুটি পায়ে।
সে বাড়ি আজ পর হলো
সমাজের নিয়মের অছিলায়।
এমন রূপে প্রভুযদি
তৈরি করো এক মেয়েকে
তৈরি করো তাকেও তুমি
যে যত্নে রাখবে তাকে।
যে জুড়বে ডানা
খুলবে বেড়ি
উড়তে দেবে তাকে,
পিছিয়ে পড়লে
বলবে জোরে;
এগিয়ে চলো -
আমি আছি, তোমার পাশে।
পরম যত্নে ঝিনুকে ফোন
আগলে রাখে মুক্তরে
সেও তেমন আগলে রাখবে,
তাকে, নিজে রক্ষান্তরে।
এমন আড়ালে পায় যদি
প্রতিটি ঘরের মেয়ে,
সেদিন হতে বলবেনা কেউ,
পোড়া কপাল, জন্মেছে
এক মেয়ে।

ইচ্ছে

দেবস্মিতা স্যানাল
ফিজিক্স অনার্স, চতুর্থ সেমিস্টার

ইচ্ছা করে হতে মেঘে ভাসতে আকাশের কোলে,
ইচ্ছে করে হতে বাতাস যার দোলায় ফুল দোলে।
ইচ্ছে করে নদীর মত বইতে কলকল,
ইচ্ছে করে সোনালী রোদে করতে ঝলমল।
ইচ্ছে করে ঝরঝর করে ঝরতে হয়ে বৃষ্টি,
ইচ্ছে করে হতে ভগবানের অপরূপ এক সৃষ্টি।
ইচ্ছে করে পদ্ম হয়ে জলের বুকে ফুটতে,
ইচ্ছে করে রামধনুর সাত রং গায়ে মাখতে।
ইচ্ছে করে ঝরনা হয়ে ঝরে ঝর করে ঝরতে,
ইচ্ছে করে দুই হাতে ওই পাহাড়চূড়া ধরতে।
ইচ্ছে করে গোধূলি আকাশে রঙের ডানা মেলতে,
ইচ্ছে করে পূর্ণিমার ওই চাঁদের সাথে খেলতে।
ইচ্ছে করে হতে তরঙ্গ সাগরের,
ইচ্ছে করে হতে রঙিন নৌকো কাগজের।
ইচ্ছে করে পাখি হয়ে আকাশের উড়ে চলতে,
ইচ্ছে করে রাতের আকাশে তারা হয়ে জ্বলতে।
নানান রঙের রংবেরঙের রঙিন রঙিন ইচ্ছে,
দূরের ওই প্রাপ্ত থেকে আমাকে ডাক দিচ্ছে।

বাবা

লাবনী সরকার
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

বাবা, বাবা বলে ডাকি তোমায়
খুঁজে পাই না,
বাবা তুমি কোথায় গেলে
কোনো দিনও তোমার
পাইনি ভালোবাসা,
তোমাকে, মাকে নিয়ে থাকবো সুখে
আমার মনে বড়ো আশা
ছোট্ট বেলায় হারিয়ে গেছো
পেলাম না আমি খুঁজে
কষ্ট, দুঃখ নিয়ে আমি
থাকি যে সুখ বুজে
কোথায় আছো? কেমন আছো?
জানতে ইচ্ছা করে!
মায়ের কথা, আমার কথা
মনে কী তোমার পড়ে?
তোমার ছোট্ট মেয়ে হয়েছে আজ বড়ো
বাবা, তুমি একটি বার দেখতে চলে এসো।
তোমার কথা মনে পড়লে
খুব কষ্ট হয়,
এই কষ্ট চেপে আমি
থাকি নিরালায়।
তাড়াতাড়ি তুমি এসো ফিরে
তোমার মেয়ের কাছে,
তোমার মেয়ে তোমার আসার
পথ চেয়ে যে আছে।

অপেক্ষা

প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী
ইতিহাস বিভাগ, ষষ্ঠ সেমিস্টার

আজও আছি সেই দিনের অপেক্ষায়
হারিয়েছি যে দিন অজানায়,
ছোটো বেলার কিছু স্মৃতি কথা আজ,
মনের ভিতর দোলা দিয়ে যায়।
সেই যে মায়ের কোলে গল্প শোনা
আর বাবার আঙুল ধরে হাঁটতে শেখা,
সেই খেল না বাটি আর পুতুল খেলায়
হারিয়ে যায় সে দিন, কোন ভিড়ের মেলায়,
আসত যদি আবার ফিরে
রেখে দিতাম বন্দি করে,
তাই তো আছি সেই দিনের অপেক্ষায়
হারিয়েছি যে দিন অজানায়।
মনে পড়ে সে স্কুলের কথা,
প্রথম পিঠে ব্যাগ, আর বই খাতা,
মনে পড়ে সেই ছুটির ঘন্টা,
বন্ধুর সাথে বাড়ির পথটা,
মনে তো পড়ে কত কিছু আরও
চোখে মুখে ওড়ে,
স্মৃতির ওড়না।

WHAT CAN I DO

Rampita Sarkar
Chemistry Hons., Sem-II

Time was running out
Full moon was also coming soon
I had to go into the forest
My nails were getting longer
And fur were covering me
Blood was also calling me
And I was traumatised
Now tell me what could I do ?

Then I had heard some noise
And had seen some boys
And what I had seen after
Has given me chills
And I had lost my mind
Now tell me what could I do ?

I had seen a girl full of blood
With no clothes and no soul
And fear and hatred in eyes
Now all of my senses had gone
Now tell me what can I do ?

The moon is really bloody again
But I am not feeling the thirst of blood
Instead of that I am feeling sad
And fear is haunting me
Because I am a girl too
Now tell me what can I do ?

Every day is becoming more violent
And everyone is becoming blind today
Parents are worrying more
We are becoming more silent
Those real human wolves are becoming more greedy
Now tell me what can I do ?

Please help me
My heart is getting colder
I am feeling day by day
Acids are now roaming freely
And are coming towards us
Some girls are getting hurt and some are not
Now tell me what can I do ?

Now I am becoming confused
Is this the rule ?
Is this the freedom ?
Is this the life of a girl ?
Now tell me what can I do ?

Magnificent ? or, magnified cent!

Adrija Paul
Chemistry Hons., Sem II

When you cried for me,
At that moment when I stepped back,
You said, " everyone has suffered loss-
Life is just like getting head or tail in a toss".

Through the endless woes when I traveled,
Each time you dear -
Bestowed eternal love on me.
Through you, the world that I could see-
The manifestation of an adorable feeling of warmth
- Though not

I was blind - I ran after infatuation,
Though You continued explaining.
With the advancement of time, when I started to notice;
You already started degrading
- And it was too late.

You fell from the branch
And I caught you in the arc of my palm.
A shining droplet from my eyes touched you gently
And everything around, was unusually calm.

You pointed towards your branch,
Towards a little bud-
As green as you were once,
And you said-
- "That is hope!"

Hiraeth

Kausani Das
English Hons., Sem V

The Bloody sun heralds darkness
Silently the night sets in,
The nocturne sings a lullaby
to which the city falls asleep
Every hopeless lover craves their beloved,
The coldness of their beds
Strangling them to death!
Cowardly, my tired lone frame crawls.
back to you,
Seeking shelter in those arms of intimacy!
Clotted desire under my veins revolt,
Your memories hostile to my heart !

How I long to be beside you,
To fill my lungs with your smell,
your lips brushing the nape of my neck,
Your finger worshipping my bare skin,
your warm breath addressing the loose
tresses on my temple.
Our limbs crisscrossed like creepers
romanticizing a stick,
We allow ourselves to remain silent
To soak in the presence of each other,
To travel together amongst stars and constellations,
Amidst wide sunflower fields and orange sunsets.

This thirst eternal,
The wait seems perennial,
This deep inborn sense
to return to
you, my Hiraeth !

আগোচর অনুরাগ

মাসুমা খাতুন
প্রাণিবিদ্যা বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

ছেলে বেলার দিন গুলি মনে পড়ে
কত স্বপ্ন ছিল তোকে ঘিরে,
ইচ্ছা ছিল থাকব দুজন চিরদিন পাশে
ছেড়ে যাব না অবশেষে।
সবই ছিল তোর অজানা
শুরুটা এখনই নয় বহু বছর আগের ঘটনা।
সময় পেরিয়েছে কমেনি একটুও আবেগ
অবকাশ দ্রুত চলে যায়, যেন আলোর গতিবেগ।
ইচ্ছে জেগেছে অনেক বার তোকে বলার
শঙ্কা ছিল একটায় তোকে পুরোপুরি হারাবার।
সবকিছু চাওয়া তোকে পুরোপুরি হারাবার
সবকিছু চাওয়া, হয় না পাওয়া দুনিয়াতে
থেকে যা বাস্তবে দূরের হয়ে কাছের তো শুধু কল্পনাতে।
যদি প্রকাশ করেই দিই প্রত্যাবর্তন হবে কি তার
যত্ন নিয়ে গুছিয়ে রাখব একবার বল তুই আমার
অমনোনয়ন করিসও যদি, ভুলতে পারব কি এত সহজে
দূর থেকেই না হয় করে যাব দোয়া
চাইব তোর ভালো বিহান সাঁঝে।

ছন্দ

ছান্দসী প্রামানিক
বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

জানালা কোণে মান-অভিমান।
ঈশান কালো মেঘ, ঝরে যাওয়া অবকাশে বৃষ্টি ...
শূন্যতা শেষের শুন্য পথ ...
তুমি আমি সমান্তরাল রেখা ধরে বয়ে চলি দূর প্রান্তর ...

এখন বেশ সুখেই আছি

কুহেলী বর্মন
বাংলা বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

আচ্ছা তোমার মনে পড়ে আমায়?
আজ কারণে অ-কারণে কাকে রাগ দেখাও?

আজ কি কষ্ট হয় আমার জন্য তোমার?
অনুভব করতে পারো আমার শূন্যতা?
খুব জানতে ইচ্ছে করে যে..
আজো কি কেউ থেকে গেছে আত্মসম্মান বলিদান দিয়ে?

আজ কার সাথে তাকে তুলনা করো?
যেমনটা আমার সাথে করতে অন্যের প্রেমিকাদের?
তোমার নতুন মানুষ কি আমার থেকেও ভালো, সুন্দরী, বুদ্ধিমান আধুনিকা?

আমারও হয়েছে নতুন মানুষ একটু বেশি অভিমানী তবে শান্ত,
সে কথায় কথায় গালি দেয় না রেগে গেলে কবিতা লেখে
একটু চোখের আড়াল হলে
আমার দেখার বায়না ধরে
অভিমান একটু বেশিই আছে
কিন্তু পর কথায় বিশ্বাসী নয়
ভালোবাসায় মানে বোঝে
প্রেমিকার কদর জানে
তোমার মতো চোখের জলকে
নাটক বলে মনে করেনা
অভিমানে কষ্ট পেলে বরং বুকের মধ্যে যে জাপটে ধরে

ভেঙ্গে পড়লে দূরে না ঠেলে
শক্ত করে হাতটি ধরে
রাগ করলে রাগ ভাঙাতে
একগুচ্ছ গোলাপ আনে

কারোর সাথে তুলনা করে না
হতেও বলেনা আধুনিকা

মুখের ব্রণ, চোখের কালি
এসব নিয়েও মাথা ব্যাথা নেই

বেশি সুন্দরী স্মার্ট দেখাতে আধুনিক পোশাক ও পড়তে বলে না
শাড়ি আর চোখের কাজলে
বলে তুমি অপরূপা যে।

ভালোবাসার ওপর অধিকার দেখায় ইচ্ছের খাটায় না জোর
বলে ভালোবাসলে স্বাধীনতা দিতে হয়
জোর করে কাউকে যায় না রাখা
কোনো কিছুই গোপন রাখে না
মনের কথা সবই বলে

নীরব হলে ঢং বলে না
নিস্তব্ধ হওয়ার কারণ খোঁজে

ভুল করলে ছেড়ে যায় না
শুধরে দিয়ে থাকবো বলে
যার সাথে সমন্বয় নয়
মনের মিল অনেক খানি
এখন রোজ বিকালে ইচ্ছে হলেই আমরা দু'জন ঘুরতেও যাই

এখন ইচ্ছে মতো ঘুরতে পারি
স্বাধীনতা বাঁধা যে নাই

অনেক খালি বিশ্বাস আছে
ভরসা আছে সম্পর্কের
এখন আর রাগ ঝগড়ায়
ব্লক-আনব্লকের খেলা চলে না

এখন তোমার কথা আর
মনে পড়েনা।

অন্যের মুখে তোমার নাম শুনলে
বুক কাঁপেনা ঈর্ষাও জাগে না
এখন তোমাকে পাশ কাটিয়ে নতুন মানুষের
হাত ধরে হেঁটে যাওয়ার সাহসও রাখি
নতুন মানুষ বড্ড ভালো অতীত জেনেও পাশে আছে
এখন বেশ ভালোই থাকি
নতুন মানুষ কে আঁকড়ে ধরে।

মানুষ গড়ার খেলা

সুমিত্রা দত্ত
প্রথম বর্ষ

আমরা সবাই মানুষ হতে চাই
আচ্ছা মানুষ কেমন হয়?
বাবা বলেন, সবাই মানুষ নয়
যারা তোমায় ভালোবাসে
তারাই আসল মানুষ হয়।
মানুষ মানে, নিজের স্বার্থে ভুলে
অন্যের বিপদে ঝাঁপিয়ে পরা।
মানুষ মানে, নিজেকে নয়
অপরকে আগলে রাখা।
মানুষ মানে, অপরের আবেগে
নিজের আবেগ ভাসিয়ে দেওয়া।
মানুষ মানে অহংকার নয়
অপরের থেকে আর্শিবাদ নেওয়া।
মানুষ মানে হিংসা নয়
অপরের শান্তির কারণ হওয়া।
মানুষ মানে অপরের জন্য
নিজেকে বদলে নেওয়া।
মানুষ মানে অভুক্ত মানুষের মুখে অন্ন তুলে দেওয়া।
মানুষ মানে ব্যভিচারী জীবন নয়।
অল্পতে সুখ খুঁজে নেওয়া।
আচ্ছা, আমরা সবাই মানুষ হব
এই কথাটি বলি।
সত্যি কি আমরা সবাই
আসল মানুষ হতে পারি?

তোমার দেওয়া কলম খানি

রঞ্জিতা সর্দ্দার
বাংলা বিভাগ, তৃতীয় সেমিস্টার

তোমার দেওয়া কলম খানি
রেখেছি সযত্নে -
মনেরই আঙিনায়।
ভালোবাসা ভরে দিয়েছিলে মোরে
ভালোবাসার প্রতীক হয়ে থাকবে চিরকাল।

আজ তাই বহু বছর পর ...
সেই কলমের স্পর্শেই-
তোমার কথা মনে পড়ে গেল...
মনে পড়ে গেল মধুর সেই দিন
আবেগভরা ভালোবাসার।

হয়তো তুমিও আমায় মনে করো
আমারাই মতো ...
হয়তো আবারও দেখা হবে
কোনো একদিন
এক অজানা পথিকের ভরসায়।

আশা

প্রীতিকা চক্রবর্তী

ভিন্ন ভিন্ন স্কুল হতে -
এলাম হুগলী উইমেন্স;
প্যান্‌ডেমিক হারিয়ে গেল
যেন লেখা পড়ার সেন্স

হারিয়ে গেল দুটি বছর
বন্ধুত্ব মোদের খাসা,
পড়াশোনার এগোবো মোরা
হারিয়ে গেল আশা;

যতই আসুক মহামারী-
যতই বন্ধ হোক,
এগিয়ে চলব আমরা সবে -
থাকবে মোদের ঝোঁক।

থাকবে টিকে বন্ধুত্ব মোদের
রাখবো চিরকাল,
মহামারীতে শিক্ষা নিয়ে
ফেরাবো মোদের হাল।
ফেরাতে হবে হাল।।

সমাজে প্রকৃত দুর্গা

তিথি পাল

একদুর্গা পেটের দায়ে মাটি কাটে ১০০ দিনের কাজে
ছোট্টো দুর্গা রাস্তা বানায় পিচ ও পাথর ঢালে

এক দুর্গা চা বাগানে তোলে চায়ের পাতা
একদুর্গা পাড়ায় ঘোরে সারায় লোকের ছাতা

একদুর্গা রিক্সাচালায় কোচবিহারের হাটে
একদুর্গা পেটের দায়ে খনিতে কয়লা তোলে

ছোট্টো মেয়েটি মায়ের সাথে ঘুঘনি বেঁচে স্টেশন ধারে
এক দুর্গা পেটের জ্বালায় এঁটো বাসন মাজে

ওই বধুটি সংসার চালাতে করছে নানা কাজ
তবুও মেয়েদের প্রতি সমাজের দৃষ্টি ভঙ্গি পালটায়নি আজ

এরা তো মা তোমার মতো নয়কো দশভুজা
সবাই জানি এদের কারো হয়না কখনো পূজা

মানো আমার তোমার পূজো সেদিন সত্য সফল হবে
সব দুর্গার মুখে হাসি ফুটবে যবে।

সবার সেরা ভারতবর্ষ

নাজিমা খাতুন
শিক্ষা বিজ্ঞান বিভাগ, চতুর্থ সেমিস্টার

দেশ আমাদের সবার সেরা
তাইতো গর্ব করি
এমনদেশ আছে কোথাও ?
এটাই প্রশ্ন করি
বিচিত্রময় দেশ আমাদের
তুলনা নাইকো যাহার
একই মায়ে পেটে যেন
সহস্র সন্তান
কত ধর্ম বিরাজ করে
এই দেশের মাটিতে
শত শত উৎসবে
মেতে ওঠে সকলে
দুঃখ বলে নাইকো কিছু
সবই সুখময়
সেইজন্যই সবাই বলে
ভারতবর্ষের জয়।

বিদ্যাসাগর

অপরাজিতা ব্যানার্জী
নিউট্রিশন, ষষ্ঠ সেমিস্টার

বীরসিংহের বীরপুরুষ নাম তার বিদ্যাসাগর,
আঁধার রাত্রির ন্যায় সমাজে এনেছিলেন যিনি জ্ঞানের ভোর।
উপলব্ধি করেছিলেন তিনি নারীর শিক্ষার প্রয়োজন,
পড়েছিলেন ব্যাথা-বেদনাসিক্ত নারীর অব্যক্ত মন।
বিধাবাদের জন্য পাশ করান 'বিধবা বিবাহ আইন'।
সকল প্রতিবন্ধকতাই তেজস্বীর তেজের কাছে ক্ষীণ।।
তিনিই সমাজে জাগিয়ে তোলেন জ্ঞানের ক্ষুধা,
তাঁর একাধিক অমর সৃষ্টিই সমাজের কাছে সুধা।
বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহের বিরুদ্ধে গড়েছিলেন আন্দোলন।
করেছিলেন সমাজ হতে কুসংস্কার দূরীকরণের পণ।।
তিনিই বঙ্গনীয় নবজাগরণের মূর্ত প্রতীক,
তাঁর হাত ধরেই সমাজ দেখেছিল নতুন দিক।
ভারতীয় সমাজ ও সভ্যতায় অসীম তাঁর অবদান।
সমাজ সংস্কারক রূপে সমাজে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন প্রাণ।।
বিদ্যাসাগর, বঙ্গমাতার এক প্রবাহ প্রতীম জ্ঞানবর্তিকা।
তিনিই আমাদের ললাটের অনুপ্রেরণার টিকা।

ক্ষত

মধুমিতা পাত্র

কর্ম দিয়ে পরিচয় দেবো ....
রইবো না ভাগ্যের বিচারের ওপর ...
চেষ্টা রইল সত্যি করার স্বপ্ন গুলো
চেষ্টা দেখেছি যত ...
মিলিয়ে যাবে ভালোবাসায় আসবে ...
আসুক আসবে কত ক্ষত।

ফিরে পাওয়া

রম্পিতা সরকার
রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

সময়ের সাথে হারিয়ে যাওয়া
না বলা কত কথা।
লাইব্রেরির সেই ঘরটায় আজ
শুধুই গল্প গাঁথা।
সময়ের কোলে মিলিয়ে গেছে
চেনা জানা কত মুখ।
বুকসেল্ফের বইগুলোয় আজ
শুধুই অচেনা সুর।
টেকনোলজির হাত ধরে আজ
মুঠফোনেই বন্দী যে বই।
পাঠাগারের বেঞ্চে যে তাই
বাসা বেঁধেছে উই।

এইতো সেদিন
হঠাৎ করে,
খুঁজে পেলাম
বইয়ের ভিড়ে,
পুরনো এক বইয়ের পাতা।
জরা জীর্ণ অল্প ভরা।
চোখ বুজে সেই তৃপ্ত ছোঁয়ায়।
হারিয়ে গেলাম কোন সে বেলায়।

টিং টিং টিং শব্দে হঠাৎ
ফিরে এলাম বাস্তবতায়।
চোখ রাখলাম মুঠফোনে
সোশ্যাল দুনিয়ার নোটিফিকেশনে।

বইয়ের পিডিএফ গুলো সেথায়
সাজিয়েছে তার ডালি।
ছড়িয়ে দিচ্ছে খুশি তথায়
আনন্দ রাশি রাশি।

হারিয়ে যায়নি বই প্রেমীরা
আছে হেথায়-সেথায়।
সময় শুধু এগিয়ে গেছে
বর্তমানের পাতায়।

নভেল করোনা

সুপ্রীতি ঘোষ
ভূগোল বিভাগ

এসেছে এক নামকরা ভাইরাস
নাম তার নভেল করোনা
করোনা করোনা এমন করোনা
যার জন্য সবাইকে বলা হয়
বাড়ি থেকে বার হইও না।
দিনে দিনে ছড়াচ্ছে এমন ভাবে
মানুষকে বাঁচানো যাচ্ছে না কোনোভাবে,
একদিন তার বিনাশ হবে
গোটা বিশ্ব স্বাধীন হবে
মুখোশ খুলে ঘুরবে বিশ্ববাসী
এটাই আমরা কামনা করে আছি।

নারী স্বাধীনতা

শ্রেয়া ঘোষ
রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, পঞ্চম সেমিস্টার

সমাজের এই হিংস্রতাকে
সময় হয়েছে ভাঙার
কিছু মানুষরূপী অসুরদের এবার
করতে হবে সংহার,
নারীর শরীর যাদের কাছে শুধু
বিনোদনের যন্ত্র
সমাজ থেকে এই ধারণা করি নির্মূল
এসো ধারণ করি এই
নারী স্বাধীনতার মন্ত্র।।
অহিংস নীতিকে ত্যাগ করে
এবার সময় রুখে দাঁড়ানোর
প্রতিবাদের ভাষা করব, ধারণ,
ভয় পাবো না আর ওদের শাসানোর,,
শুধু আইনের প্রতি অপেক্ষা না করে
নিজেদের মেরুদণ্ড করি শক্ত,
আসিফা ও প্রিয়াঙ্কা হওয়ার আগে,
আমরা স্মরণ করি
রাণী লক্ষ্মীবাঈ এর জীবনের প্রবন্ধ।

অনেক দিন পর

সত্যজিৎ বিশ্বাস
অধ্যাপক, রসায়ন বিভাগ

মেরুদণ্ড একটু সোজা রেখো
জীবন কাটবে বিলাসবীহীন সুখে।
চলার পথে আয়নায় নিজেকে দেখো
মান অভিমান পাশে সরিয়ে রেখে।।
কঠিন পথ পেরোতে হবে জেনো
একাই- যদি চলতে হতে হয়।
পিতা-মাতার আদেশবাণী শুনো
তবেই যদি পাহাড় চূড়া করতে পারো জয়।।
চলতে পথে হোঁচট খাবে জেনো
রক্তে হবে সিক্ত খড়া মাটি।
থমকে যেনো থেকো না কখনো
জীবন কী আর হয় গো পরিপাটি।।
এখন তো সবে ১৮-১৯ হবে
জীবন এখনও ঢেড় রয়েছে বাকী।
ভোর পেরিয়ে বেলা শুরু সবে
চিন্তা কেনো করছো আমরা তো সঙ্গে আছি।।

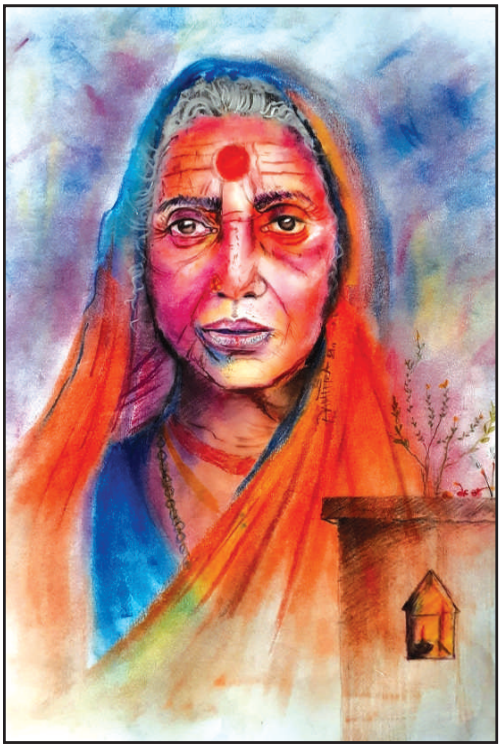

অয়ন্তিকা লাহা

অঙ্কিতা দাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বি.এস.সি.

অঙ্কিতা দাস, ষষ্ঠ সেমিস্টার, বি.এস.সি.

সম্পূর্ণা চক্রবর্তী

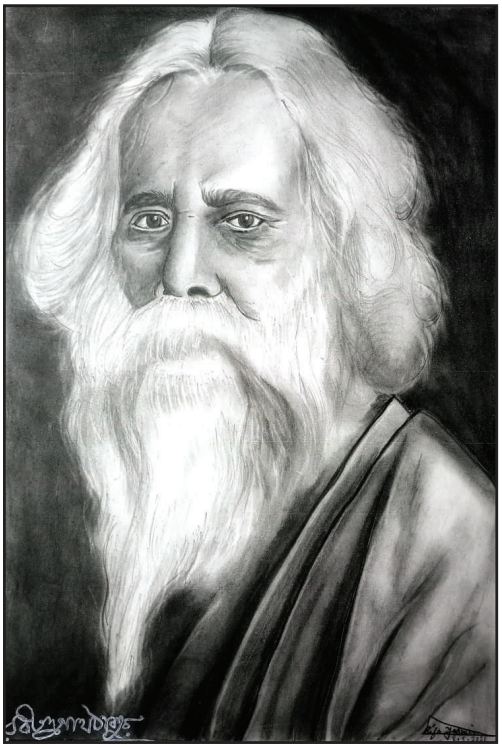

রিফা ইয়াসমিন, দ্বিতীয় সেমিস্টার

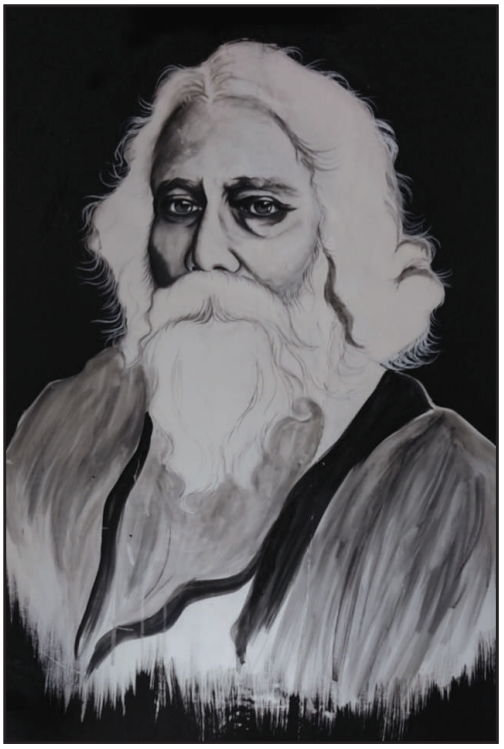

রিফা ইয়াসমিন, দ্বিতীয় সেমিস্টার

রিফা ইয়াসমিন, দ্বিতীয় সেমিস্টার

অদ্রিজা পাল, রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

নিলোফার ফিরদোশ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

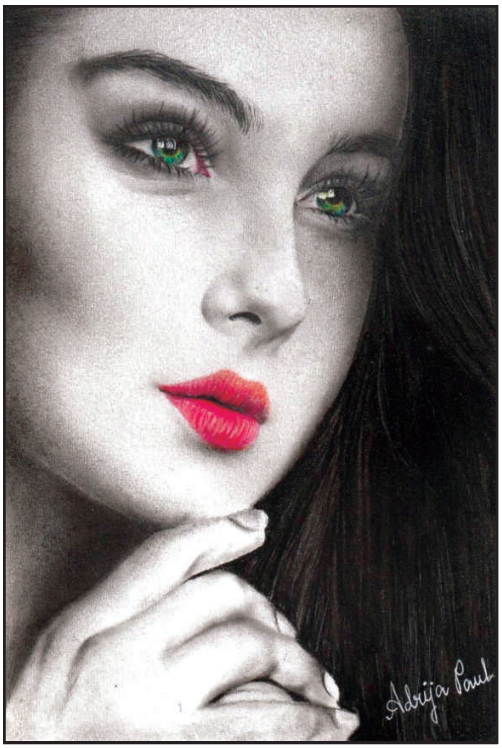

অদ্রিজা পাল, রসায়ন বিভাগ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

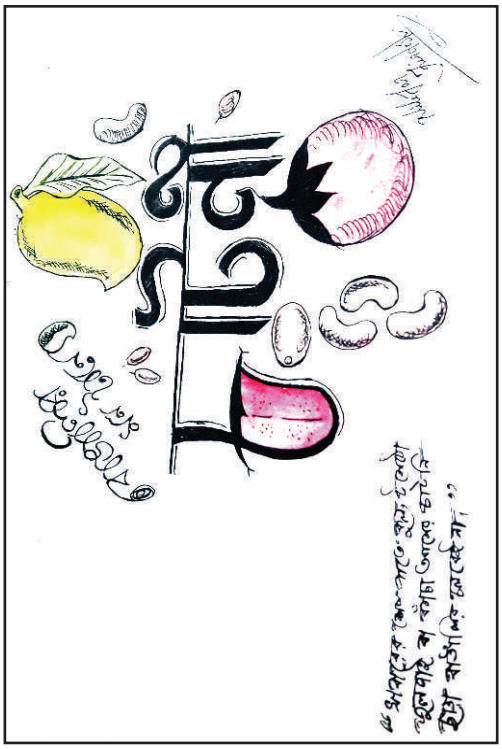

নিলোফার ফিরদোশ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

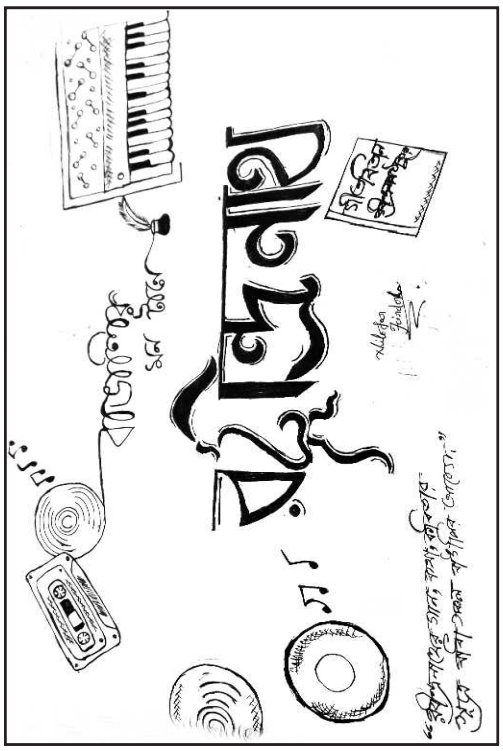

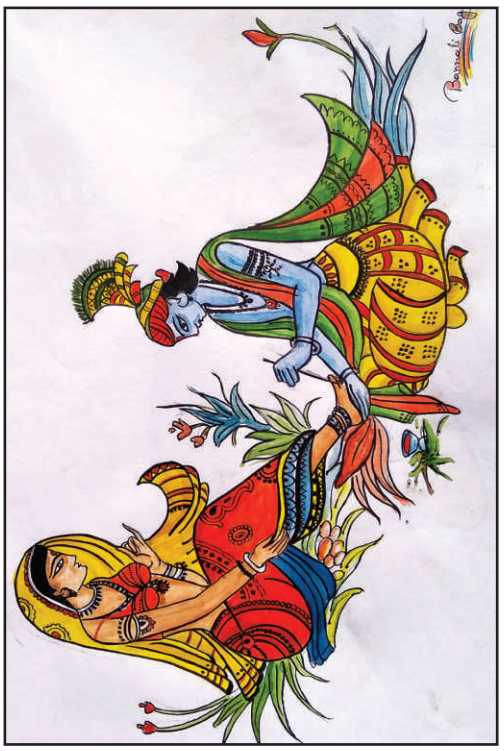

নিলোফার ফিরদোশ, দ্বিতীয় সেমিস্টার

প্রিয়াঙ্কা চৌধুরী, ষষ্ঠ সেমিস্টার

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

স্নেহা কোলে, বিভাগ - ভূগোল

তুলিকা প্রধান, ষষ্ঠ সেমিস্টার

তুলিকা প্রধান, ষষ্ঠ সেমিস্টার

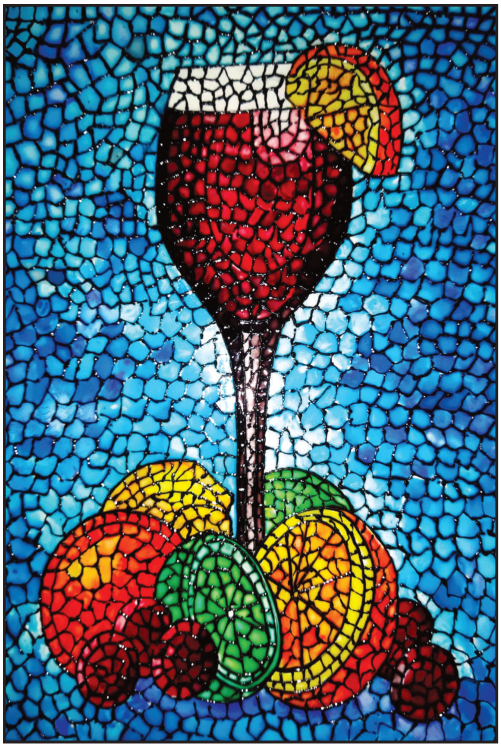

তুলিকা প্রধান, ষষ্ঠ সেমিস্টার

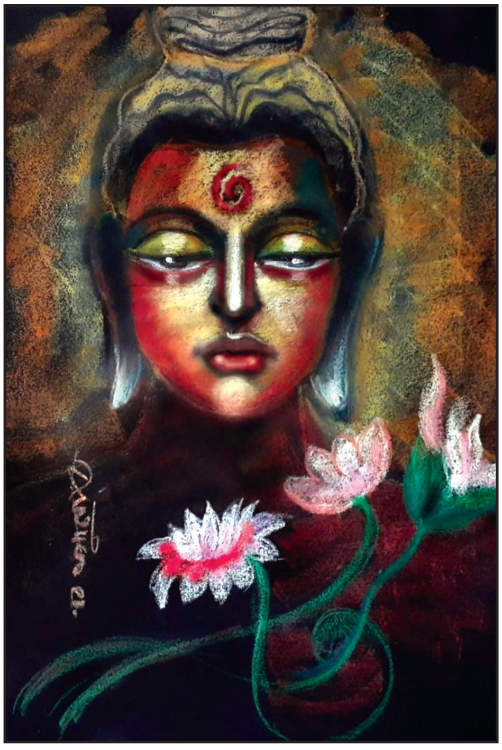

অয়ন্তিকা লাহা